ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ।। ২৩ শ্রাবণ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৯ আগষ্ট, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের বলি জনজাতিরাও

গূঢ় পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভার ভোটের এখনও ঢের দেরি আছে। হিসাব মতো আগামী বছরের মে-জুন মাসের আগে নয়। কিন্তু গত ২১ জুলাই ধর্মতলার জনসভায় তৃণমূল নেত্রীর কথা শুনে সকলেরই মনে হয়েছে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসাটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কারণ, চেয়ারে বসেই তিনি কী কী কাজ করবেন একটা লম্বা চওড়া তালিকা জনসভায় শুনিয়ে দিয়েছেন। এই তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দরাজ প্রতিশ্রুতি। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন ৩৫ বছরের সিপিএমের 'এক দলীয় শাসনের' অবসান ঘটিয়ে তিনি 'মা-মাটি-মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার' ফিরিয়ে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গেলে নেত্রীকে সর্বপ্রথম তাঁর দলের ভৈরব বাহিনীকে সংযত করতে হবে। নতুবা পূর্ব মেদিনীপুরের মা-মাটি-মানুষের প্রতিনিধি অধিকারী পরিবারের অনুসরণে রাজ্যের জেলায় জেলায় গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরিবারতন্ত্রের জন্ম হবে। মনে রাখতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় আসেনি। তা' সত্ত্বেও পূর্ব মেদিনীপুরে যেভাবে অধিকারী পরিবারে

(এরপর ৪ পাতায়)

মাওবাদীরা চার্চেরই তৈরি

শুধু মধ্যভারতেই বছরে ১২শো কোটি টাকা ব্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জনজাতি এলাকার দখল নেবার জন্য মাওবাদীদের 'সৃষ্টি' করেছে চার্চ— এই মর্মে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের হাতে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে। এই সূত্রে যে খুব একটা গলদ নেই তা প্রকাশ্যে না হলেও গোপন আলোচনায় মেনে নিচ্ছেন দেশের গোয়েন্দাবাহিনীরই একাংশ। সংবাদমাধ্যমের কাছে খবর রয়েছে, ভারতীয় এবং নেপালী মাওবাদীরা জনজাতিদের খৃষ্টান ধর্মান্তরকরণ করছে এবং তার বিনিময়ে চার্চের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রে মদতদাতা হিসেবে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের গোয়েন্দা বাহিনীর নামও জড়িয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই হয়তো বিগত কয়েকবছরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করতে গিয়ে যে পরিমাণ বাধার সম্মুখীন এবং আহত ও নিহত হয়েছেন হিন্দু সন্ন্যাসীরা, সে তুলনায় কোনও বাধাই কিন্তু পাননি খৃষ্টান মিশনারীরা। উপরন্তু মিশনারীদের প্রচারক্ষেত্র আগে থেকেই মাওবাদীরা প্রস্তুত করে রেখেছিল বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, প্রতি বছর ১২,০০০ কোটি টাকা মধ্যভারতের বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য আসছে পশ্চিমী চার্চের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা ও বৃটেনের গোয়েন্দাবাহিনীর প্রায় ৪০০০ এজেন্ট খৃষ্টান মিশনারীর বেশে ওই সমস্ত এলাকাগুলোতে ভারতবিরোধী মাওবাদী কাজকর্মে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে পুরোদমে চলছে খৃষ্টান ধর্মান্তরকরণও।

ইতিপূর্বে গত ৬ মে কোচি থেকে প্রকাশিত ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের একটি

অস্ত্র হাতে মহিলা মাওবাদী ক্যাডাররা।

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যদীপম'-এ মাওবাদী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডের হাজারীবাগের একটি চার্চের জনৈক বিশপ চার্লস সোরেঙ্গের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারে চার্লস বলেন, জনজাতিরা সমানাধিকার এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধার দাবিতে যুদ্ধ শুরু করেছে। মাওবাদীরা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জনজাতিদের দিকে, বিশেষ করে যেখানে জনজাতিরা সঠিক 'বিচার' (জাস্টিস) ও 'অধিকার' (রাইটস) পাচ্ছে না। এই কারণেই মাওবাদী হওয়াটা তার 'উপভোগ' (এনজয়) করছে। ওই সাক্ষাৎকার জুড়ে মাওবাদীদের স্তুতি করার পাশাপাশি সেই বিশপ এও বলেন— ''সঠিক ন্যায়-বিচারের জন্য কিছু সৎ লোক (পড়ুন মাওবাদীরা) আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা অর্থ এবং ক্ষমতা পাওয়ার জন্য কিছু করছে না বলেই, তারা আমাদের আক্রমণ করছে না।'' তবে রেড করিডরের সন্ত্রাসের জন্য বিশপ চার্লস মাওবাদীদের দায়ী না করে 'অন্য লোক মাওবাদের নামে এসব করছে' বলার পাশাপাশি সরকারকেও একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে গরীব মানুষ ন্যায্য বিচার ও অধিকার না পেলে এবং দেশ থেকে দুর্নীতি দূর না হলে তার ফল ভাল হবে না। সত্যদীপমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশপ চার্লস সোরেঙ্গ আরও বলেছেন, ''আমরা (অর্থাৎ চার্চ) সন্ত্রাসের পক্ষপাতী নই। কিন্তু মাওবাদীরা দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত পদ্ধতির (কোরাপট সিস্টেম) দিকে তাদের লক্ষ্য স্থির করেছেন।'' এই ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট যে মুখে গা-জোয়ারি তর্ক করে 'মাওবাদী সন্ত্রাসে'র দায়ভার যদিও নিলেন না বিশপ, কিন্তু একটু ঘুরপথে এই 'সন্ত্রাস'কেই' প্রকাশ্য সমর্থন করলেন তিনি।

এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবার পর তা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন দিল্লীর রাজনৈতিক মহল বিশেষ করে কংগ্রেস। কিন্তু জনমানসে একটা আলোড়ন তৈরি হচ্ছে বুঝে কেরলের ক্যাথলিক বিশপ কাউন্সিলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র স্টিফেন আলাথারা সাক্ষাৎকারটিকে ওই বিশপের ব্যক্তিগত মতামত বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম যিনি মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সবসময়ই খড়্গহস্ত তিনিও এব্যাপারটা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেন কেন? সোনিয়া গান্ধীর শ্রদ্ধাস্পদ চার্চ জড়িয়ে আছে বলে?

রামমন্দির নির্মাণে চাই জনজাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ত্রিপলের তলায় আর কতদিন থাকবেন রামলালা? —এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কলকাতায় ভারতীয় ভাষা পরিষদের সভাগৃহে দু'দিন ধরে এক জাতীয় সেমিনার হয়ে গেল। যদিও কেউ কেউ একে সেমিনার না বলে 'ওয়ার্কসপ' বলতে আগ্রহী। বিশ্বসংবাদ কেন্দ্রের কলকাতা শাখা এই আলোচনা সভার উদ্যোক্তা। আলোচ্য বিষয় ছিল—শ্রীরামজন্মভূমি ঃ তথ্য ও বাস্তবতা। ৩১ জুলাই ও ১ আগস্টে আয়োজিত এই সভায় ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিসহ মোট ১৪টি প্রদেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। শ্রীরাম-জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য দেশজুড়ে জনজাগরণই এখন আশু প্রয়োজন বলে সভায় আলোচনা সূত্রে

কলকাতায় আয়োজিত সভার রায়

বক্তব্য রাখছেন চম্পত রাই, (বসে) রবিরঞ্জন সেন, নৃপেন আচার্য ও সোরেন সিং পূর্তি।

উঠে আসে। উল্লেখ্য, রামজন্মভূমি নিয়ে গত ৬০ বছর ধরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে মামলা চলছিল তার শুনানি শেষ হয়েছে এবং আগামী সেপ্টেম্বরে তার রায় ঘোষণা করা হবে বলে মাননীয় বিচারপতিরা জানিয়েছেন।

এদিন আলোচনা সভার সূচনায় মূল সুরটি বেধে দেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর ঘটনার পরেও শ্রীরামলালার পূজা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কেউই এর বিরোধিতা করেনি। সরকার সুরক্ষার বন্দোবস্তও করছে। তাই এখন সব রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে সংসদে আইন তৈরি করে শ্রীরামজন্মভূমি হিন্দু সমাজের হাতে তুলে দিক— হরিদ্বারে

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সিপিএমের মদতে বিপর্যস্ত পাঠক-স্বার্থ

রমাপ্রসাদ দত্ত।। পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও এই রাজ্যের অনেক সরকারি সংস্থার মতো রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সাবালকত্ব অর্জন করতে পারেনি। না পারার কারণ হিসেবে অনেক বড় তালিকা তুলে ধরা যায়। তার বদলে কয়েকটি দিক নিয়ে বলা চলে। একসময় সংশয় প্রকাশ করতেন লেখাপড়া জানা কিছু মানুষ— রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কি রাজ্য প্রশাসনের বাইরে? কেউ কেউ একটু এগিয়ে বলতেন—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রক্তাল্পতায় ভুগছে। স্বীকার করা যায়, এরাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেশ কম ছিল। একসময় গ্রন্থাগার বিভাগটা ছিল শিক্ষা বিভাগের অধীন সমাজশিক্ষা বিভাগের মধ্যে। শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ এমনিতেই কম ছিল। তার মধ্যে সমাজশিক্ষা বিভাগ খুবই অবহেলিত ছিল বরাবর। অথচ এরাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা ছিল গালভরা। প্রচারের ঢাক বাজানো হয়েছিল গোড়াপত্তনের সময়েই। সারা রাজ্যকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনভাবে ছেয়ে ফেলা হবে যাতে কেউ ভুলেও বলতে না পারেন ওই বইটা আমার পড়া হলো না, অমুক বইটা আমি পেলাম না। পাঠক যদি লাইব্রেরিতে আসতে না পারেন লাইব্রেরি এগিয়ে যাবে পাঠকের কাছে।' ঘোষণা অনুযায়ী কিছু কাজ হয়েছিল বৈকি। পিরামিডাকৃতি গঠনে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে ওঠে। শীর্ষে রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। তারপর জেলা গ্রন্থাগার। এরপরে মহাকুমা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। নিচে

গ্রামীণ গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে ভালোমতো। জেলা গ্রন্থাগারের গাড়ি বই পৌঁছে দেবে গ্রামীণ মহকুমা বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে। সেখান থেকে বই যাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে থাকবেন সাইকেল পিওন। তিনি সাইকেলে ট্রে লাগিয়ে বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দেবেন। এছাড়া বুক মোবাইল সারভিস বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার থাকবে। এমন ঘোষণাকে রূপ দেওয়ার জন্য লোকজন নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোনও কাজ পাওয়া যায়নি। বামপন্থী সরকারি কর্মী সংগঠনের নেতারা বলেছিল, 'আসবো যাবো মাইনে পাবো কাজ করবো না।' একই মনোভাব সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে রাজ্যের সর্বত্র। শীর্ষে থাকা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও একই ছবি দেখা গেছে।

আর তার মধ্যে কিছু কর্মী কাজ করেছেন

(এরপর ৪ পাতায়)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সময়ের আহ্বান

আজতক-এর উপর আক্রোশ বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের অধিকাংশ দর্শকই দেখিয়াছেন। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এই স্তম্ভ তাই সত্যান্বেষী, অবিক্রয়যোগ্য এবং নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। ঘটনা হইল, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সব কয়টি স্তম্ভের অবস্থাই করুণ। চতুর্থ স্তম্ভও ইহার ব্যতিক্রম নয়। অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন এখন আর কোনও নতুন কথা নহে। প্রধান প্রধান সংবাদ মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ছবি প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইদানীং তাহাও লক্ষ্য করা যাইতেছে।

কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া টুডে 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ' (স্যাফ্রোন টেররিজম) শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রদর্শন করিতেছিল। এই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রী ইন্দ্রেশজীর ছবি বারবার দেখাইয়া বলা হইতেছিল যে তিনি আজমীর ও মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের মামলায় প্রধান অভিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া যে কোনও ব্যক্তির রক্ত গরম হইয়া যাইতে পারে। এই কথা ঠিক, যে সংবাদ পরিবেশন করিতেছে সে তোতাপাখী মাত্র। মালিক যাহা নির্দেশ দিয়াছে সে তাহাই বলিতেছে। কারণ উদরপূর্তির জন্য সে এখানে চাকরি করিতেছে মাত্র। এইজন্য কোনও কোনও সময় ইহাদেরকে করুণার পাত্র বলিয়া মনে হয়। মানুষ নিজের উদরপূর্তির জন্য কত দূর নীচে নামিতে পারে তাহা আমরা ইন্ডিয়া টুডে-তে দেখিতে পারি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সন্ত্রাসে মদত দিয়া চলিয়াছে—ইন্ডিয়া টুডে-তে এই কথা উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়াছে। প্রমাণ হিসাবে যাহা পেশ করিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন ও হাস্যাস্পদ। সাংবাদিকতার চূড়ান্ত অবমাননা।

ইণ্ডিয়া টুডে নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া এইরকম অপপ্রচার করিবে—এমন সাহস তাহাদের নাই। নেপথ্য থাকিয়া এই রকম অপপ্রচার কেহ করাইতেছে। ২০০৯-এর নির্বাচনের সময় শারদ পাওয়ার প্রথম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে সাধবী প্রজ্ঞার নাম জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মামলা এখন আদালতে বিচারাধীন। কিন্তু ইহার আগে থেকেই তাঁহাকে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। নামে আলাদা হইলেও পাওয়ারের দল আসলে কংগ্রেসই। দেশবিভাজন করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হত্যার রাজনৈতিক লাভ তুলিবার জন্য তাহার দায় সঙ্ঘের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। মুসলিমদের মনে সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়াছে। মুসলিমদের রক্ষা একমাত্র কংগ্রেসই করিতে পারে—এমনই প্রচার করিয়াছে। ক্ষমতালাভের জন্য মুসলিম ভোট চাই। আর মুসলিম ভোটের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে গান্ধী হত্যার প্রসঙ্গটি অপ্রাসঙ্গিক। তাই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি মুসলিম তোষণ তথা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য কংগ্রেস আমদানী করিয়াছে।

অন্যদিকে সঙ্ঘ ক্ষমতার রাজনীতি করে না। কিন্তু সঙ্ঘের আদর্শে জনমত প্রভাবিত হয়। জাতপাতের রাজনীতি সঙ্ঘ স্বীকার করে না। উপাসনা পদ্ধতির স্বাধীনতা স্বীকার করে। কেননা সঙ্ঘ মনে করে ধর্ম এক এবং তাহা সনাতন ধর্ম। সঙ্ঘের সমালোচনা কাহারা করিয়া থাকে? দ্বিগ্বিজয় সিংহ, লালুপ্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাসোয়ানের মতো রাজনৈতিক নেতারা যাহারা জাতপাতের ভিত্তিতেই রাজনীতি করিয়া থাকেন।

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চলিয়াছে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সঙ্ঘর্ষের চ্যালেঞ্জ বরাবরই স্বীকার করিয়াছে। কারণ তাহারা জানে এই সংঘর্ষ অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংঘর্ষ। শ্রীরাম ধর্মের জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরিণামে বিজয়ী হন। একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে এই সংঘর্ষ আসলে হিন্দুসমাজ ও হিন্দু সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যেই হইতেছে। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আক্রমণ মোল্লা-মৌলভী বা ফাদাররা করিতেছেন না। নিজেদের সমাজের লোকই করিতেছে। তাই সজ্জন শক্তিকেই সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাই সময়ের আহ্বান। সবক্ষেত্রেই এই সংঘর্ষ করিতে হইবে। রাজনীতির মতো সংবাদমাধ্যম এইরূপ একটি ক্ষেত্র। গত পঁচাশি বছর ধরিয়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘ সংঘর্ষ করিয়াই আপন আদর্শে অটল হইয়া আছে এবং থাকিবে। 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ'-এর অপপ্রচারের ধুয়ো তুলিয়া সঙ্ঘকে বিন্দুমাত্র টলানো যাইবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

স্বাধীন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতারা মনে করেন যে এক দেশে বাস করিলেই সকল নরনারী একটি জাতিতে সংগঠিত হইয়া গেল। তাহা যদি হইত তবে মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত হইতে পারিত না এবং দেশ বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠিত না।

এখানে চাই পরস্পরের হৃদয়ে স্নেহের স্পর্শ, প্রাণের টান, সংস্কৃতি আদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদের একত্বের বলে সৃষ্ট আত্মীয়তাবোধ। ভারতবাসীর মনে যতদিন এইরূপ আত্মীয়তাবোধ না জন্মিবে ততদিন সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগঠন অসম্ভব।

—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আর্থিক দায়িত্বশীল বিল পাশ করাতে এত তাড়াহুড়ো করছে কেন বামফ্রন্ট সরকার?

এন সি দে

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৩৩ বছর একনাগাড়ে রাজত্ব করার পর হঠাৎই আর্থিক দায়িত্বশীল হয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই বামফ্রন্ট সরকার ফাইনান্সিয়াল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (FRBM) বিল, ২০১০ পাশ করাতে চলেছে। এই বিলটি কেন তারা তড়িঘড়ি পাশ করাতে চায়, তা জানতে গেলে প্রথমে বিলটি সম্পর্কে জানা দরকার। কি এই বিল? কোন্ সরকার এই বিলটি প্রথমে সংসদে আইনে পরিণত করে? কি এর উদ্দেশ্য? এগুলি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক!

স্বাধীন ভারতের ৬৩ বছরের ইতিহাসে কেবলমাত্র পাঁচ বছরের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলেই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশ কিছু মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম পদক্ষেপই ছিল বিদেশী দ্রব্য আমদানী কমিয়ে, দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী বাড়ানো। এতে দেশের বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার স্ফীত হবে। হয়েছিলও তাই। দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে দেশ বিদেশী ঋণে ছিল জর্জরিত। ঋণ নিয়ে বিদেশীদেরই দ্রব্য কিনত। বাজপেয়ী সরকার বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডারের জমার পরিমাণ এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল এবং তারাই বিদেশী ঋণ থেকে দেশকে পুরোপুরি মুক্ত করে দিয়েছিল। উল্টে বিশ্ব ব্যাঙ্ককে ঋণদান করেছিল, যার ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কে ভারত একটি পদও লাভ করেছিল। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল পেট্রো/ডিজেলের মূল্যের উপর ও ঋণের উপর সুদও কম রাখতে পেরেছিল। ঋণের উপর সুদ কম থাকায় ছোট ছোট শিল্প এবং রপ্তানী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী উৎপাদন করতে পারত। এছাড়া আজকের 'তথ্যের অধিকার' (Right to Information) আইনটিও ছিল এন ডি এ সরকারের আমলেই তৈরি। বাজপেয়ী সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল এই Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003। এই আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থমন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা রাজস্ব ঘাটতির সীমা ৪৫ শতাংশ লঙ্ঘন না করে। লক্ষ্য হচ্ছে রাজস্ব ঘাটতি পাঁচ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৪-০৫ থেকে শুরু করে ২০০৯-১০'-র মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা। প্রতি বছর সরকারগুলিকে রাজস্ব ঘাটতি কমাতে হবে জি ডি পি-র ০.৫ শতাংশ হারে। আর রাজকোষ ঘাটতি ২০০৮-০৯'-র মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে জিডিপি'-র ৩ শতাংশে। রাজকোষ ঘাটতিও প্রতি বছর কমাতে হবে ০.৩ শতাংশ হারে।

কিভাবে এই আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হবে তার বিধানও এই আইনের ধারাগুলিতে বলা আছে। যেমন প্রতি ৬ মাসে বাজেট বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতি সীমিত রাখতে হবে। এটা লঙ্ঘিত হলে অর্থমন্ত্রীকে সংসদে কারণ দর্শাতে হবে এবং অতিরিক্ত ঘাটতি মেটানোর অর্থের সংস্থানের সংশোধিত পদক্ষেপ কি হবে তার প্রস্তাবও দিতে হবে।

এবারে আমরা দেখব রাজকোষ ঘাটতি কাকে বলে। প্রত্যেক সরকারকে তার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য রাজস্ব আহরণ করতে হয়। এই অর্থের যোগানের মূল উৎস হলো কর আদায় ও ঋণ গ্রহণ। ঋণ নেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নয়তো বন্ড বিক্রি করে পাবলিকের কাছ থেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে এবং এমনকী বিদেশ থেকেও। এগুলিকে বলা হয় পাবলিক ডেট (public debt)। রাজকোষ ঘাটতিকে তাই একটি বছরের সরকারের ঋণ নীতি বা উপায় বলা হয়। কাজেই গণিতের দৃষ্টিতে রাজকোষ ঘাটতি হলো মোট সরকারের ব্যয় থেকে রাজস্ব খাতে আয়, পুরানো ঋণ শোধের পরিমাণ এবং অন্যান্য আদায়ের যোগফল বাদ দিয়ে যা পাওয়া যায়, তাই।

FRBM Act চালু করার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেস আবার ক্ষমতা দখল করেছে বামদলগুলির সাহায্যে। আর এর ফলে আয়ের তুলনায় ব্যয় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ২০০৮-০৯'-র বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছিল ৫৫,১৮৪ কোটি টাকা, অথচ প্রকৃত ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২,৫৩,৫৩৯ কোটি টাকায়। রাজকোষ ঘাটতি ধরা হয়েছিল ১,৩৩,২৮৭ কোটি টাকা, অথচ বছরের শেষে প্রকৃতপক্ষে তা দাঁড়ায় ৩,৩৬,৯৯২ কোটি টাকায়। এই হলো কংগ্রেসী শাসনের নমুনা!

> **বামফ্রন্ট সরকার বুঝতে পেরেছে তাদের বিদায়ের সময় হয়েছে। সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস বসতে চলেছে। রাজস্ব ও ঋণের অর্থে ভর্তি রাজকোষ এবার যাবে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেসের হাতে। তারাও তাদের মতো সরকারী অর্থ ব্যয় করবে পার্টির ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। সকলে তো আর বিজেপি-র মতো বেকুব নয়, যে শুধু দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার করবে। তাই তারা এই FRBM আইন পাশ করাতে পদ্ধপরিকর।**

কমিউনিস্ট দেশগুলির অর্থনীতিকে বলা হয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। কিন্তু তাদের এই নীতি শুধুমাত্র তাদের দেশেই সীমাবদ্ধ। অ-কমিউনিস্ট দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারলে তারা কিন্তু আবার এই আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কারণ তারা তাদের সরকারের সংগৃহীত রাজস্বকে দলীয় আয় বলে মনে করে এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নির্বিচারে সেই আয়ের অর্থ বিলি ব্যবস্থা করে। একে তাদের পালিত অর্থনীতিবিদগণ আখ্যা দিয়ে থাকে Social Sector Funding (সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়) নামে। তারা খোলাখুলিই বলে থাকে তারা keynes অর্থনীতির প্রবক্তা। যিনি বলতেন সরকারের উচিৎ দেদার টাকা ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করা যাতে মানুষের চাহিদা বাড়ে। কেনার ক্ষমতা বাড়ে বলেই; আমাদের রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, আমার হাতে যদি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি কোটি কোটি টাকা ছাপিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিতাম।

সেই রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী কিন্তু এখন বিপাকে পড়ে উল্টো সুরে গাইতে শুরু করেছেন। তিনি এখন বি জে পি সরকারের চালু করা FRBM Act অর্থাৎ আর্থিক দায়িত্বশীল হওয়ার আইন এই রাজ্যে চালু করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। হঠাৎ তার এই সুর বদল কেন? আমি আগেই বলেছি এদের নীতি যখন যেমন, তখন তেমন। কয়েক মাস যাবৎ বামফ্রন্ট সরকার বুঝতে পেরেছে তাদের বিদায়ের সময় হয়েছে। সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস বসতে চলেছে। রাজস্ব ও ঋণের অর্থে ভর্তি রাজকোষ এবার যাবে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেসের হাতে। তারাও তাদের মতো সরকারী অর্থ ব্যয় করবে পার্টির ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। সকলে তো আর বিজেপি-র মতো বেকুব নয়, যে শুধু দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার করবে। তাই তারা এই FRBM আইন পাশ করাতে পদ্ধপরিকর।

আগেই বলেছি এই চপ্পপ্ত পাশ হলে রাজ্য সরকার আর যথেচ্ছ ঋণ নিতে পারবে না। তাই এই চপ্পপ্ত পাশ করানোর আগেই এই সরকার আগামী এপ্রিলের মধ্যে আরও ৯,০০০ কোটি টাকা বন্ড ছক্ষক্ষক্ষ বাজার থেকে তুলতে চায়। গত এপ্রিল '১০ থেকেই বিভিন্ন খাতে, State Development Loan (SDL) হিসাবে ৬,০০০ কোটি টাকা তুলেছে। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত রাজ্যের মাথায় এই SDL ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,০০০ কোটি টাকায়। সমস্ত ঋণ একত্র করলে এর মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৬৮,৬৮৪ কোটি টাকায়। আর এবারের বাজেট ঘাটতি ধরলে তো তার পরিমাণ দাঁড়াবে মার্চ, ২০১১-তে ২ লক্ষ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের এখন এমন অবস্থা যে ঋণ করতে হচ্ছে ঋণ শোধের জন্যে। ক্রমশ ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। গত জুন ও এই জুলাইয়ে অর্থ মন্ত্রক নোটিফিকেশন জারি করেছে যে তারা দুটি খেপে সরকারী স্টক বিক্রি করে দেবে। নাম দিয়েছে এই অর্থ উন্নয়নে ব্যয় হবে। এই অর্থও ফেরৎ দিতে হবে জুন-জুলাই, ২০১০ সালে। এখনই প্রতি বছর ঋণ মেটাতেই চলে যাচ্ছে প্রতি বছর রাজস্বের ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৫,০০০ কোটি টাকা। ঋণ জর্জরিত এই সরকারের স্টক কারা কিনবে? সন্দেহ আছে! তবে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস তো এই সরকারের ফেলে যাওয়া গদির লোভ ছাড়তে পারবে না। তাদের কি? তারা তো বলে বেড়াবে রাজ্যের এই অবস্থার জন্য আমরা দায়ী নয়, আগের বামফ্রন্ট সরকার দায়ী। এইভাবে প্রথম ৫ বছর কাটাবে। যেমন বামফ্রন্ট সরকারও কাটিয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করে। কোনও দলেরই কোনও ক্ষতি হবে না—হবে শুধু রাজ্যের। কেন্দ্রে সরকারও যতদিন থাকবে, ততদিন তারাও FRBM Act ö± Rules কঠোরভাবে প্রয়োগ করবে না, নিজেদের দলের স্বার্থে। তার প্রমাণ হলো গত ১৫ জুলাই '১০ রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসেই কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির সঙ্গে এই রাজ্যের সরকারের এক চুক্তি করিয়ে দিয়েছে, যে চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরকে ৯২০ কোটি টাকা ঋণ দেবে। প্রশাসনে সম্পূর্ণ অদক্ষ মমতাদেবীকে স্মরণ করিয়ে দিই যে রাজ্য শাসন তার রবীন্দ্র, নজরুল কবিতা আওড়ানো দিয়ে হবে না, তার নয়া দোস্তের 'প্রণব-মন্ত্র'ও বুঝতে হবে— না হলেই সর্বনাশ।

বিপর্যস্ত পাঠক-স্বার্থ

(১ পাতার পর)

বরাবর। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয় কাশীপুরে বি টি রোডের ধারে মরকতকুঞ্জ ক্যাম্পাসে। অনেকরকম পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনার কাজ রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছিল রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর। প্রতিদিন আসা পাঠকদের বসে পড়ার সুবিধাটুকু দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার করেনি। কর্মীবাহিনীর একটা বড় অংশ কোনও কাজ করতেন না। তবে কংগ্রেসি আমলে গ্রন্থাগারটিকে কেউ কখনও দলদপ্তর বা ঘাঁটি করার কথা ভাবেননি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠক সমিতি গড়ে উঠেছিল ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে। যে বছরটি রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালনও হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রাজা রামমোহন রায়ের নামে লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার। যার কাজ হবে সারাদেশে গ্রন্থাগার পরিষেবা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সহায়তা করা। রাজ্যস্তরে কাজের দায়িত্ব নেবে রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। সেভাবে কাজ এগোয়। অনেকরকম দুর্নীতি ঢুকে পড়ার কারণ টাকা পয়সার ব্যাপার জড়িয়ে ছিল।

এরাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরই গ্রন্থাগার আইন চালু করার উদ্যোগী হয়। হিতোপদেশ দিয়েছিলেন কিছু গ্রামীণ ব্যক্তি, কারা লাইব্রেরিতে কাজ করবে আগে ঠিক করা। তারপর আইন হোক। লোকজন ঠিকমতো না হলে সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হয়ে যাবে। তাই-ই হয়েছে। লাইব্রেরি খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেড়েছে। দলদাসদের যথেচ্ছভাবে নিয়োগ করার ফলে পুরো গ্রন্থাগারে ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। লাইব্রেরি খাতে ব্যয়বরাদ্দ বহুগুণ বাড়লেও পাঠক পরিষেবা দিনে দিনে শূন্যে এসে ঠেকেছে। অনেকেই বলেছেন, বিভিন্ন স্তরের সরকারি লাইব্রেরিতে দলকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, যারা সামাজিকভাবে সরকারি কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নয়। তার সঙ্গে নানারকম দুর্নীতি শিকড় ছড়িয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পেয়েও ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থাগারগুলোকে দলদপ্তরে পরিণত করা হয়েছে। পাঠকদের জন্য সমস্ত আয়োজন হলেও পাঠকরা সেখানে অবাঞ্ছিত। ১৯৭৫ সালে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠক সমিতির লেখা একটা পোস্টার ছিল ঢোকার মুখে, 'এটি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঠাকুরঘর নয়, ডাকাতের ডেরা নয়, দলদপ্তর নয়। এখানে মাথা উঁচু করে প্রবেশ করুন।' পরে সে পোস্টার থাকেনি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কাঁকুড়গাছিতে নিজস্বভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর পাঠকদের সংগঠন ছিল না। বিশাল দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগার গৃহ কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকার প্রচারের ঢাক পিটিয়ে বলতে চেয়েছে, আমরা কত ভালো লাইব্রেরি ভবন তৈরি করেছি। কিন্তু অনেকে বলেছেন, ভবন সর্বস্ব গ্রন্থাগার। বড়মাপের আয়োজন কিন্তু পরিষেবা প্রায় শূন্য।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা দপ্তর নিয়ন্ত্রক ছিল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও সেভাবে চলত। পরে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা বিভাগ হয়। আলাদা বিভাগ হলেও স্বতন্ত্রভাবনা নিয়ে জনমুখী পাঠকমুখী গ্রন্থাগারে পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ দেখা যায়নি। বরং পাঠক-বিরোধী, গ্রন্থস্বার্থ বিরোধী কাজকর্ম বেড়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিপিএম দল কঠোর নিয়ন্ত্রণে সব কিছু চালিয়েছে দল স্বার্থ মাথায় রেখে। রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একজন গ্রন্থপাঠক মেরুদণ্ড সোজা রেখে অনেক কাজের উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁকে সিপিএম দল কলকাঠি নেড়ে নানাভাবে হেনস্থা করেছে। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগে যোগ্যতার থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দল-আনুগত্য। এইসময় অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে, বছরে কয়েক কোটি টাকা যে গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ সেই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পাঠকরা কি পাচ্ছেন? সিপিএম অনেক কিছু শেষ করার মতো রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকেও কি শেষ করতে ব্যস্ত?

তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের বলি জনজাতিরাও

(১ পাতার পর)

শাসন চলছে তারপর তৃণমূল নেত্রী কীভাবে হলদিয়ার শেঠ পরিবারের তালুকদারির নিন্দা করবেন? কাঁথির সাংসদ পরিবার এবং হলদিয়ার শেঠ দম্পতির অনুসৃত গণতন্ত্রের মধ্যে কতটা গুণগত পার্থক্য আছে তা' ভেবে দেখা দরকার।

তৃণমূল নেত্রী অশান্ত জঙ্গলমহলের লালগড়ে জনসভা করছেন। এখান থেকেই তিনি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করছেন। ভাল কথা। কিন্তু লালগড় থেকে কেন? মমতাপন্থীরা বলছেন এই জঙ্গল মহলেই সি পি এম যৌথ বাহিনীকে সামনে রেখে চরম হিংসার রাজনীতি করছে। মানুষ খুনের পর মৃতদেহের পাশে হাতে লেখা মাওবাদী পোস্টার ফেলে রেখে সি পি এম খুনের দায় এড়াচ্ছে। জঙ্গলমহলে সি পি এম যৌথ বাহিনীকে ঢাল করে এলাকা দখল করছে। যে এলাকায় দ্বিতীয় অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রবেশ নিষেধ। এরই প্রতিবাদে নিজের জীবন বিপন্ন করে মমতা জঙ্গলমহলে লাগাতার আন্দোলনে নামছেন। এই জনজাগরণ, মা-মাটি-মানুষের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন... ইত্যাদি।

এতকাল জঙ্গলমহলে এলাকা দখলের লড়াইটা ছিল মাওবাদীদের বনপার্টির সঙ্গে মার্কসবাদীদের লালপার্টির মধ্যে। এর বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনও অস্তিত্ব ছিল না। গণতন্ত্র বলতে আমরা যা' বুঝি তারও কোনও অস্তিত্ব ছিল না। দলতন্ত্রই ছিল শেষ কথা। কলকাতার মহাকরণে যে দল ক্ষমতায় বসেছে, জঙ্গল মহলে সেই দলের লুঠেরা বাহিনীর বন্দুক দাপিয়ে বেড়িয়েছে। জঙ্গলমহলে বন্দুকই আজও শেষ কথা বলে। মমতা এখানেই তৃণমূলের 'নিজস্ব গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লড়াইতে সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তবে শুধু একা সিপিএমকে কেন? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইতে মাওবাদীদেরও চ্যালেঞ্জ জানানো উচিৎ। কারণ এই মাওবাদীরা সংসদকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' এবং গণতন্ত্রকে স্রেফ 'ধাপ্পাবাজি' বলে প্রচার করে। মার্কসবাদী এবং মাওবাদী উভয়েই গণতন্ত্রের শত্রু। এদের মতবাদে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থান নেই। তাই জঙ্গলমহলে তৃণমূল নেত্রীর জনজাগরণ যাত্রায় এই দুই লাল পার্টির দলতন্ত্রের বিরুদ্ধেই হওয়া উচিৎ নয় কি? বনবাসীদের দুর্দশা দুর্গতির জন্য কংগ্রেসও সমান দায়ী।

স্বাধীনতার পর দেশে দীর্ঘকাল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যেই কংগ্রেস শাসকরা আদিবাসীদের উন্নয়নে অবহেলা করেছে। এর সুযোগ নিয়েই লালপার্টি বনপার্টি বন্দুক নিয়ে এখন সমর্থন পেতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। লালপার্টিতে নাম লেখালে বনপার্টি খুন করবে। বনপার্টিতে নাম লেখালে পুলিশ-প্রশাসন-সি পি এম যুক্তভাবে খুন করবে। কোনও পার্টিতেই নাম না লেখালে লালপার্টি বনপার্টি পুলিশ যৌথ বাহিনী সকলেরই শত্রু বলে চিহ্নিত হতে হবে। এবার জনজাতিদের মৃত্যুতাড়িত জীবনে তৃণমূলের নামও যুক্ত হতে চলেছে।

রামমন্দির নির্মাণে চাই জনজাগরণ

(১ পাতার পর)

কুম্ভমেলায় সন্ত সম্মেলনে গৃহীত এই প্রস্তাবের কথা তিনি জানান। সভার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য।

শ্রীরামজন্মভূমি সংক্রান্ত চারটি বিষয়, যথা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রমাণাদি, রামজন্মভূমি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি (ডাইমেনশন), আইনগত দিক এবং রামজন্মভূমি আন্দোলনের উত্তরাধিকার (লিগ্যাসি)। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধিবেশনের সভাপতি ডঃ প্রণব রায়, ডঃ বি এন পন্ডা, অরুণ শর্মা। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুনীত আগরওয়াল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক তথা কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক রণজিৎ রায়। আইনগত দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রণেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং অ্যাডভোকেট অমিত চক্রবর্তী। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব গিরি মহারাজ। সভার শেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেস কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য অসীম কুমার মিত্র, আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ দেবানন্দজী মহারাজ।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১২৫ জন এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে ১০২ জন প্রতিনিধি এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর বিনিময়ও হয়। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর হলেও সভার মেজাজটা ছিল উপভোগ্য। এই দুদিনের সভা পরিচালনা করেন রবি রঞ্জন সেন ও জিষ্ণু বসু।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে

নিশাকর সোম

যে কথা বারবার এই কলামে লেখা হয়েছে, সেটাই দুই যুযুধান দলের নেতা-নেত্রীর বক্তব্যে প্রমাণিত হচ্ছে। ২১ জুলাই-এর বিশাল জনসভায় নেত্রী একবারও ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের জন্য শোক প্রকাশ করলেন না। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটাই সুর— "আমি আস্‌ছি— তোমাদের সব কষ্ট থেকে মুক্তি দেব।" এ যেন কোনও দেবদূতের আশ্বাস বাণী। বক্তৃতায় বললেন, তিন-চার মাস অপেক্ষা করুন— সব হয়ে যাবে। যদিও ট্রেন দুর্ঘটনার পিছনে সিপিএম-এর হাত আছে বলে রেলমন্ত্রী তথা তাঁর দল বলছেন। এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না-করে বলতে চাই যে, সিবিআই এবং উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। একদিকে বলা হচ্ছে, মাও-মার্কসবাদী মিলিতভাবে হিংসাত্মক কাজ চালাচ্ছে। অথচ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেননি নেত্রী। কেন? উপরন্তু নেত্রী দাবি করলেন, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা ঠিক করে ফেলেছেন যে কোনও মূল্যে রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীকে তোষামোদ করে চলবেন। কেন? কারণ স্পষ্ট— বামপন্থীরা কংগ্রেসের প্রতি বাম। বিজেপি-র উত্থান হচ্ছে। অ-কংগ্রেসি পার্টিগুলির নেতারাও ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে জনগণের উপর আর্থিক সঙ্কটের চাপ বাড়বেই। পক্ষান্তরে জনগণের স্বার্থ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইউপিএ সরকার বিরোধী বাম এবং বিজেপি ও অ-কংগ্রেসি দলগুলির সমান্তরাল ঐক্য গড়ে উঠবে। যার পরিণতিতে কেন্দ্রে শাসক দলের পরিবর্তন হবেই।

রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনি জঙ্গলমহলে সভা করতে যাবেন। এ-দিকে নিরাপত্তার কারণে জঙ্গলমহলে কোনও জেড ক্যাটাগরির নেত্রীর যাওয়া উচিত কি না— সেটা বিচার করুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রেলমন্ত্রী দিল্লিতে না গিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ না দিয়ে এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হবার জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কেশব রাও '২১শে'-এর জনসভায় মমতার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাজে অংশগ্রহণ না করার নীতিকে সমর্থন করেছেন।

"মুখ্যমন্ত্রী যখন তেজের সঙ্গে বলছেন, "আমরা ছিলাম— আমরা আছি —আমরা থাকবো", ঠিক তখনই মহাকরণে পুলিশকর্মীদের সভায় বুদ্ধবাবুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে পুলিশ-কর্মীদের নেতৃবৃন্দ হুংকার ছাড়ছেন। পুলিশের মধ্যে রাজনীতি আনার ফলে এবার ভুগবেন বুদ্ধবাবুরা।"

রাজ্য-কংগ্রেস নেতা ডাঃ মানস ভুঁইয়ার বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে—তাঁর দল পারবে না, কাজেই এই বিশাল সমাবেশে তিনি হম্বিতম্বি করে গেলেন। ২১ জুলাই-এর বিশাল সমাবেশে নেত্রী একবারও রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য আবেদন জানালেন না। কেন? এটা পরিষ্কার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সিপিএম-তৃণমূল-এর 'যুদ্ধ' শুরু হবে। তার ফলে নিচের তলার কর্মী এবং সাধারণ মানুষ মারা পড়বেন। নেতারা দিব্যি স্বচ্ছন্দে থাকবে। মনে পড়ে যায়, ১৯৭১-৭২ সালে যখন বেলগাছিয়ায় সাধারণ সিপিএম কর্মীরা অত্যাচারিত হয়েছেন, ঠিক তখনই উত্তর কলকাতা পুলিশের ডি সি বিভূতি চক্রবর্তী লক্ষ্মী সেনের ছেলেকে নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর সাধারণ কর্মীরা তাঁর হাতে গ্রেপ্তার এবং লাঞ্ছিত হচ্ছেন— এ কথা আমাকে জনৈক মজুমদার বলেছিলেন। এই অশান্তির বিরুদ্ধে — শান্তিপ্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করাটাই অন্যতম রাজনৈতিক কর্তব্য বলে মনে হয়।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী যখন তেজের সঙ্গে বলছেন, "আমরা ছিলাম— আমরা আছি —আমরা থাকবো", ঠিক তখনই মহাকরণে পুলিশকর্মীদের সভায় বুদ্ধবাবুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে পুলিশ-কর্মীদের নেতৃবৃন্দ হুংকার ছাড়ছেন। পুলিশের মধ্যে রাজনীতি আনার ফলে এবার ভুগবেন বুদ্ধবাবুরা। একটা কথা— গত ২১ জুলাই-এর সৃষ্টিকর্তা হলেন 'জ্যোতি বসু'। তাঁর আমলেই মমতাদেবীর উপর পুলিশি আক্রমণ হয়েছিল এবং তাঁর পরিণতিতে মমতাদেবী হয়ে উঠলেন 'এক সংগ্রামী নেত্রী'। সবই সিপিএম-এর কু-কীর্তির পরিণতি।

সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস-বিরোধী লাইনই গৃহীত হয়েছে। সেখানে বিমান-ইয়েচুরির লাইন সংখ্যালঘু। বুদ্ধবাবু তো কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যাননি। বুদ্ধবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের সভাতেও যাচ্ছেন না, পলায়নী মনোভাব নিয়েছেন। এতেই কিন্তু তাঁর বিরোধী মনোভাব তৈরি হচ্ছে। বুদ্ধবাবুকে পর্যদুস্ত হয়েই ক্ষমতা-নেতৃত্ব ছাড়তে হবে। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে সরে যাবার অনুমতি দেবেন না।

ইতিমধ্যে সিপিএম রাজ্য-নেতৃত্ব ও জেলা-নেতৃত্বের স্তরে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে হাওড়ার জেলা-সম্পাদক পদে বিপ্লব মজুমদার আসীন হলেন। এঁর কথা এই কলামে বহু আগেই লেখা হয়েছিল। হাওড়ার প্রাক্তন জেলা-সম্পাদক শ্রীদীপ ভট্টাচার্যকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে পার্টির কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ-এর জেলা-নেতৃত্বের রদবদল হবেই। পুরুলিয়ার দায়িত্ব থেকে বিমান বসুর দায়িত্ব সরিয়ে রবীনদেব-কে আনা হচ্ছে। বিমানবাবুর বিরুদ্ধে পার্টির রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে তীব্র সমালোচনা উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগণায় অমিতাভ নন্দী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শমীক লাহিড়ী সম্পাদক হতে পারেন।

এ রাজ্যে কংগ্রেস-এর ছিন্নভিন্ন অবস্থা এবং ক্ষয় হয়ে চলেছে। আই এন টি ইউ সি থেকে তৃণমূলী নেতা সুব্রত মুখার্জিকে সরানোর পর সুব্রতবাবু আই এন টি ইউ সি-কে ভাঙার কাজে কনভেনশন করার দিকে এগোচ্ছেন। রাজ্য-কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে মানস-বিরোধীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে প্রদেশ কংগ্রেস-এর সভাপতিকে তৃণমূল নেত্রীর মতানুসারে চলতে হবে। এ-প্রসঙ্গে ২১ তারিখের সভায় নেত্রী বলেছেন, "আমরা একলাই পৌর নির্বাচন জিতেছি। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা থাকবে।" এর অর্থ হলো—'আমাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েই কংগ্রেস-কে ঐক্য মানতে হবে।' হ্যাঁ, এটাই আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অবস্থা। দীপা দাসমুন্সির বিরুদ্ধে গনি-পরিবারকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। শঙ্কর সিং-দের কোণঠাসা করার কাজ সম্পূর্ণ। কলকাতার প্রদীপ ঘোষ-কেও 'আচ্ছা শিক্ষা' দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসের বহু কর্মী ক্ষমতার দিকে থাকার জন্য তৃণমূলে চলে যাবেন। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও বহু কর্মী তৃণমূলে যাচ্ছেন। আর এস পি-তে পদত্যাগী কৃষকনেতা অশোক চৌধুরী বর্তমান আর এস পি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেলা সফর করে পাল্টা সংগঠন গড়ার দিকে এগোচ্ছেন। এসবই আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট হবেই। ক্ষমতার লালসায় সবাইয়েরই জিহ্বা লেলিহান।

অন্য রকম

পরশমণি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দাউ দাউ করে পুড়ছে বাড়িটা। দমকল কর্মীদের ব্যস্ততা, দৌড়োদৌড়ি। অসহায় প্রশাসন। অ্যাম্বুলেন্সের হাঁক-ডাক চরমে। তারই মাঝে জলবর্ষণ। কিন্তু সেই জলের প্রাবল্যের সাধ্য হচ্ছে না যে অগ্নিগ্রাসকে রোখে। সংবাদমাধ্যমের টিপ্পুনি— বাড়ি তো নয় যেন জতুগৃহ। গম্ভীর মুখে সরকারের কোনও মন্ত্রীমশাই ঘটনার অব্যবহিত পরে পরিপাটি বেশে ঘোষণা করছেন যে শীঘ্রই নাকি

পরেশ রাওয়াল ও স্বরূপ সম্পত।

এব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হবে এবং তারাই পুরো ব্যাপারটাতে খতিয়ে দেখে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করবে। বলা বাহুল্য, এই খতিয়ে দেখতেই দেখতেই মেঘে মেঘে বেলা গড়িয়ে যায়। দোষীর শাস্তি দেওয়াটা তাই সহজবোধ্য (?) কারণেই হয়ে ওঠে না। এর পরপরই আরও একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে। তাতে বলা হয় মৃতের পরিবার অমুক লক্ষ ও আহতের পরিবার তমুক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে ও সেই সাথে তাদের পরিবারের একজনের অন্তত চাকরি বাঁধা। ভোটের আগে যদি এই অগ্নিকান্ড ঘটে এবং রাজ্যসরকারের পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের পার্টি যদি পরস্পর যুযুধান হয় তবে তো ক্ষতিপূরণের খেলটা আরও জমে যায়। কিন্তু যার দেহের অধিকাংশ জায়গাই পুড়ে গেছে, সেই ক্ষত নিয়ে তার বাকি জীবনটা কিভাবে কাটবে, কখনও ভেবে দেখেছেন ক্ষতিপূরণ দাতারা? সরকারের অপদার্থতায় আর মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের, সেইসঙ্গে নিজেদের অসাবধানতায় সারাটা জীবন চর্মযন্ত্রণার বলি হলো যারা, স্রেফ লোক দেখানোর স্বার্থে ক'টা টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব সারবে সরকার?

সরকার কি করবে তা জানার উপায় নেই। তবে অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষমতা যে সরকারের নেই একথা সকলেরই জানা। ওপরে অগ্নিদাহের যে ঘটনাটি এতক্ষণ ধরে বর্ণিত হলো সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে তা প্রায়শই চোখে পড়ে। কলকাতা কিংবা তার মধ্যে বড়বাজার তো বটেই সারা ভারত জুড়েই অসংখ্য 'স্টিফেন কোর্টে'র নিদর্শন পাওয়া যাবে। আগুনের লেলিহান শিখা যাদের দংশন করেছে তাদের বাঁচানোর কথা কেউ না ভাবলেও তাদের পুড়ে যাওয়া গাত্রে পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়ে পোড়া দেহে নবীন প্রাণ সঞ্চারে ব্রতী হয়েছেন ওঁরা। ওঁরা মানে পরেশ রাওয়াল ও তাঁর স্ত্রী স্বরূপ সম্পত।

অভিনয় গুণে পরেশ রাওয়াল আজ একটি পরিচিত মুখ। তাঁর স্ত্রী সম্পতও কম যান না এব্যাপারে। মডেলিং-এ সফল হবার পাশাপাশি তিনি গ্রুপ থিয়েটার, দূরদর্শন এবং বড়-পর্দারও একজন সফল অভিনেত্রী। উচ্চশিক্ষায় ডক্টরেটও করায়ত্ত করে ফেলেছেন তিনি। এই অভিনেতা-অভিনেত্রী দম্পতি অঙ্গীকার করেছেন তাদের গায়ের চামড়া দান (পোশাকী নাম স্কিন গ্রাফটিং) করবেন তাঁরা। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মুম্বাই-এ বছরখানেক আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ন্যাশনাল বার্ন ইনস্টিটিউট স্কিন ব্যাঙ্কে-এ গিয়ে ইতিমধ্যেই এই কর্মটি সেরে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের এহেন কাজের ফলে পুড়ে গিয়ে চামড়া নষ্ট হয়ে যাওয়া বহু মানুষ আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতেই পারেন। এই চামড়া দানের ব্যাপারটা অনেকটা রক্তদানের মতোই। যিনি চামড়ার ওপরি ভাগ (এপিডারমাল লেয়ার) দান করবেন স্কিন গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে তার দেহে পুনরায় 'এপিডারমিস' সৃষ্টি হবে। সেইসাথে দান করা চামড়া কোনও পুড়ে যাওয়া সজীব দেহে প্রতিস্থাপন করলে তাতে নবজীবনের সঞ্চার হবে। অর্থাৎ যিনি চামড়া দান করলেন তাঁর কোনও ক্ষতি হলো না, উপরন্তু বাঁচিয়ে দেওয়া গেল একটি অগ্নিদগ্ধ প্রাণ। এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দেখেই পরেশ রাওয়ালের চামড়া দান করার চেতনা জাগ্রত হয়। তিনি পাশে পেয়ে যান স্ত্রী সম্পতকেও। তাঁরা আশা করছেন তাঁদের এই কাজে দেশবাসী উৎসাহিত হবেন এবং স্কিন-ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবেন। প্রসঙ্গত, দেশের মধ্যে স্কিন-ব্যাঙ্ক বর্তমানে একমাত্র মুম্বইতেই দু'জায়গায় রয়েছে। একটির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, অপরটি মোটামুটি প্রাচীন, মধ্য মুম্বইয়ের এল টি এম জি হাসপাতালের স্কীন ব্যাঙ্ক। তারকাদ্বয়ের চামড়া দানের অভিনব কীর্তিতে সারা দেশ উৎসাহিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্কীন-ব্যাঙ্ক গড়ে উঠবে এটুকু আশা করাই যায়।

সাঁইথিয়া রেল দুর্ঘটনার সেবাকাজে সঙ্ঘ

সংবাদদাতা ॥ গত ১৮ জুলাই মধ্য রাতে সাঁইথিয়া তথা বীরভূমের মানুষ প্রত্যক্ষ করল এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। ঘটনার আকস্মিকতায় স্টেশন সংলগ্ন মানুষজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নিজেদের সামলে নিয়ে দ্রুত নেমে পড়ে উদ্ধার কাজে। এই বিপদের দিনে বসে থাকতে পারেনি সঙেঘর স্বয়ংসেবকরা। স্থানীয় স্বয়ংসেবক ভুটুদা প্রথম রেলকর্মচারী মারফৎ খবর পান। তারপর দেবজিৎ রাম, গৌতম ব্যানার্জী, সুবোধ সাহা প্রমুখ কার্যকর্তাদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ংসেবকরা একত্রিত হয়ে উদ্ধার কার্যে নেমে পড়ে। স্টেশনের শেষপ্রান্ত আলো-আঁধারি পরিবেশে ভীষণ যন্ত্রণায় যখন মানুষজন কাতরাচ্ছে, বাঁচার জন্য চিৎকার করছে, তখন তাদের প্রথমে ট্রেন থেকে বের করে প্লাটফর্মে রাখা হয়। কিন্তু কিভাবে হাসপাতালে পাঠানো হবে? রাস্তার ধারে কয়েকটি রিক্সাই তখন সম্বল। তাতে করেই স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা দেবজিৎ রামের নেতৃত্বে স্টেশন সংলগ্ন থানায় গিয়ে পুলিশ অফিসারের সাথে একপ্রকার ঝগড়া করে থানার চারটি গাড়ি জোগাড় করে এবং আহতদের প্রথমে সাঁইথিয়া মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে সিউড়ী সদর হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। সরকারিভাবে ৬২ জনের মৃত্যুর খবর থাকলেও স্থানীয় উদ্ধারকর্তাদের হিসাবে মৃত শতাধিক। উদ্ধারকার্যে রেল বিভাগের তৎপরতা ও পরিকাঠামোর অভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিকে সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ীর পথে সরকারি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স, মিনিট্রাকের মাধ্যমে কিভাবে জখম, মৃত, সংজ্ঞাহীন যাত্রীদের দ্রুত সিউড়ী হাসপাতালে পৌঁছানো যায়—এইটাই তখন সবার লক্ষ্য। সিউড়ী সদর হাসপাতালে খবর পাওয়া মাত্রই সঙেঘর স্বয়ংসেবকরা সেবা কাজ শুরু করে দেয়। এক একটি গাড়ি থেকে আহতদের নামিয়ে ভর্তি করা, বেডে রেখে আসা। স্থানীয় কার্যকর্তা কালোসোনা মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি টিম সব সময় ডি. এম-এর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে কখন কি আশু প্রয়োজন। জেলা কার্যবাহ শিবাজী মণ্ডল এবং উজ্জ্বল নায়ক, মলয় সাহা, বিশু দত্ত প্রমুখরা আহত যাত্রীদের আত্মীয়দের সাথে কথা বলা, তাদের নিকটজনের খবর দেওয়া, রক্তের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ করে চলেছেন। একদিকে স্বয়ংসেবকরা যখন প্রচারের তোয়াক্কা না করে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজ নিজ দলীয় পতাকা নিয়ে প্যান্ডেল করে সেবা কাজে তাঁরা কতটা এগিয়ে তার প্রচার করে চলেছে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিতেই তারা ব্যস্ত। স্বয়ংসেবক ও বাকীদের আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে সেদিন সিউড়ী তথা বীরভূমবাসী —হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে প্রশাসননিক কর্তারা। রেল বিভাগের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে দেয় অর্থের বিতরণের সময় উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও সঙেঘর কার্যকতাদের ডাক পড়ে।

সিউড়ী হাসপাতালে আহতের পাশে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

গত ২৮ থেকে ৩১ মে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আদ্যখণ্ড ভুমানন্দ পুরীর আশ্রমে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির চারদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন সমিতির আদ্যখণ্ডের সঞ্চালিকা লক্ষ্মী সরকার। বৌদ্ধি কবর্গে উপস্থিত ছিলেন সঙেঘর ইটাহার মহকুমার সঙঘচালক নিমাই মন্ডল, সমিতির উত্তরবঙ্গের পর্যবেক্ষক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, ইটাহার মহকুমার সেবিকা সমিতির সঞ্চালিকা বিজয়া আচার্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সম্পাদক নকুল ঝাঁ, ইটাহার উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক প্রশান্ত ব্যানার্জী, কিষাণ সঙেঘর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক অনিল রায় প্রমুখ। ৩১ তারিখ সকালে শিবির সংলগ্ন এলাকায় পথ সঞ্চালন অনুষ্ঠিত হয়। সমারোপ অনুষ্ঠানে সমিতির উত্তরবঙ্গের সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার সভানেত্রীর এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের যুগ্ম সম্পাদক গৌরহরি চক্রবর্তী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রবন্ধিকা ও অধিকারী মিলিয়ে মোট ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

লেবার কমিশনারের আশ্বাস

ভারতীয় ই ডি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুগন্ধিকুমার মিশ্র জানিয়েছেন, তাঁদের সংগঠনের কর্মীদের দুইদিন (৫ জুলাই ও ৬ জুলাই) ব্যাপী অনশন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ডেপুটি চীফ লেবার কমিশনার ডি কে পান্ডে গত ২১ জুলাই ডাক বিভাগ ও তাঁদেরকে আলোচনায় ডেকে ছিলেন। ইউনিয়নের দাবি মেনে প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে সেখানে আলোচনা হয়। ডি কে পান্ডে তাঁদের আশ্বাস দেন, ওই দাবি সম্বলিত রিপোর্ট যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে। আলোচনা সন্তোষজনক বলে শ্রী মিশ্র জানিয়েছেন।

নানাজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ

দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সংগঠন সম্পাদক অভয় মহাজন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, প্রয়াত নানাজী দেশমুখের জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ১১ অক্টোবরে তাঁর ছবি ও বাণী সম্বলিত স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে এবং চিত্রকূটেই গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন রেখেছেন, কেউ ব্যক্তিগতভাবে নানাজীর সম্পর্কিত কিছু সংগ্রহ করে থাকলে বা কোনও পত্র পত্রিকায় নানাজীর ছবি বা আর কিছু সংগৃহীত থাকলে তাঁরা যেন ইনস্টিটিউটে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। এক্ষেত্রে আর এস এসের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনোমোহন বৈদ্যের সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে।

সমাবেশ সমাচার

সমবায় ব্যাঙ্কে দুর্নীতি

রামকৃষ্ণপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে দুর্নীতির জন্য আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত জমাটাকা ফেরৎ পাচ্ছেন না। এই অভিযোগে বিজেপি-র হাওড়া জেলা কমিটি গত ৫ জুলাই হাওড়া জুটমিলের সামনে কুন্ডেলবাগানে এক জনসভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য সৌমেন চক্রবর্তী প্রমুখ।

শ্যামাপ্রসাদ জন্মোৎসব

গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১০৯তম জন্মদিনে টালিগঞ্জ-করুণাময়ী অঞ্চলের ইউনাইটেড ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গত, গত ২৬ জুন উক্ত ক্লাব প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৮০ জন কচি-কাঁচা ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৬ জুলাই তাদের প্রত্যেককে পুরষ্কৃত করা হয়। তাছাড়া ক্লাব সভাপতির হাতে ক্লাবের জন্য শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ, আর এস এসের পূর্ব ক্ষেত্রের সঙঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সভার সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্যামল দাশ ও শক্তিশেখর দাসের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবপ্রসাদ চৌধুরী।

* * *

৬ জুলাই বেলঘরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে। এর মধ্যে বেলঘরিয়া যতীন দাস নগরের পথসভা, মোহিনী মিল ক্লাব ঘরের আলোচনা-চক্র উল্লেখযোগ্য। গত ২৩ জুন সেখানে আয়োজিত হয় বলিদান দিবস।

রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশত-বর্ষ

গত ২৭ জুন রবিবাসরীয় প্রভাতে নবদ্বীপের শ্রীশ্রী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া কুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হলো কবি প্রণামের মাধ্যমে। স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্র বিষয়ে আলোচনা করেন সুভাষ ভট্টাচার্য। শিল্পী ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন বিজনকৃষ্ণ কুন্ডু, সভাপতি ছিলেন সুকোমল রায়, সম্পাদক তপন মুখার্জি ও সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিল বাসুদেব সাহার ওপর।

শোক-সংবাদ

প্রয়াত বিশ্বরাজ মুখোপাধ্যায়

গত ২৩ জুলাই সকালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু হলো বিশ্বরাজ মুখোপাধ্যায়ের। ৮৪ বছরের বর্ণময় জীবনে

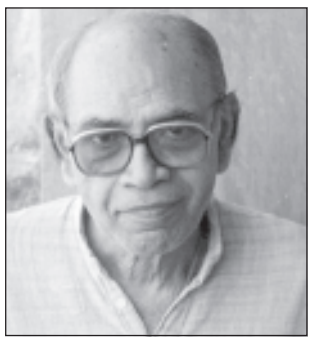

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, গুরুসদয় দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র হলেন তাঁর পিসতুতো বোন। গত বছরই তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেঙ্গল মাস এডুকেশন সোসাইটি শিশু কল্যাণমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার লাভ করে। বিশ্বরাজবাবুর পিতা ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' হিসেবে তৎকালীন সমাজে পরিচিত ছিলেন এবং রচনা করেছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ। বিশ্বরাজবাবুর ঠাকুর্দা যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় (উত্তরকালের জ্ঞানানন্দ স্বামী) ছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপাধন্য। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, এক নাতি ও দুই নাতনিকে রেখে গেলেন। বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য-সহসভাপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের তাঁর একমাত্র পুত্র।

পরলোকে সদানন্দ পান্তাওয়ালে

চলে গেলেন সঙেঘর প্রবীণ প্রচারক সদানন্দ পান্তাওয়ালে। গত ২৬ জুলাই সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি ওড়িশার বালেশ্বরে সামান্য রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

স্বাধীনোত্তর ভারতে সঙঘ কাজের বিস্তারের জন্য যে কয়েকজন মারাঠী যুবক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। মহারাষ্ট্রের কাহার সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে নাগপুরে পরবর্তীকালে সঙেঘর নির্দেশেই ওড়িষাতে সঙঘ কাজের বিস্তারে অংশগ্রহণ করেন। ওড়িষাতে সঙঘ কাজ বৃদ্ধি তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সঙেঘর দ্বিতীয় সরসঙঘচালক বালাসাহেবজী এবং প্রয়াত দত্তপন্ত ঠেংড়ীজীর কাছ থেকে প্রেরণ নিয়ে তিনি ষাট বছরেরও বেশী সময়কালে ওড়িষাতে সঙেঘর কাজে ব্রতী ছিলেন।

তাঁর অন্তিম শয্যায় শ্রদ্ধা জানাতে ওড়িষার সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিলেন।

■ ■ ■

কোচবিহারের মাথাভাঙার স্বয়ংসেবক মানব ঘোষের মাতৃদেবী দিপালী ঘোষ গত ১৭ জুন মধ্যরাতে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা, দুই পুত্রবধূ, দুই নাতি ও এক নাতনিকে রেখে গেলেন।

■ ■ ■

গত ৯ জুলাই ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করলেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক সত্যনারায়ণ বাগলা। তিনি প্রান্ত সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ শিবকুমার বাগলার মধ্যম ভ্রাতা।

■ ■ ■

পূর্ব কলকাতা বিভাগ কার্যবাহ বিশ্বনাথ নন্দীর বোন অনিমা নন্দী গত ১৪ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

■ ■ ■

দক্ষিণ কলকাতা বিভাগের ব্যবস্থা প্রমুখের মধ্যম ভ্রাতা নাগিনভাই রূপওয়াল গত ১০ জুলাই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

■ ■ ■

গত ২৪ জুন মালদার বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বয়ংসেবক অজিত মৈত্র পরলোক গমন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। কর্মজীবনে আইনজীবীর ব্যস্ত পেশার মধ্যেও ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন। এছাড়াও সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির আজীবন সভাপতি ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

■ ■ ■

গত ১১ জুলাই মালদা শহরের প্রবীণ আইনজীবী ও স্বয়ংসেবক বিনয় ভূষণ সরকার পরলোক গমন করেন। ছাত্রজীবনে যোগ দেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে পর পর তিনবার বিজেপি-র প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

কেরলকে 'মুসলিম দেশ'-এ পরিণত করার চক্রান্তের কথা স্বীকার কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতবর্ষকে 'মুসলিম দেশ' (দার-উল-ইসলাম)-এ পরিণত করার আশঙ্কার কথা এবার ধ্বনিত হলো খোদ এক কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। মুসলিম মৌলবাদে জর্জরিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন গত ২৪ জুলাই বলেন, ''মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব্ ইন্ডিয়া (পি এফ আই)-র সক্রিয় কর্মীরা যেভাবে একজন কলেজ লেকচারারের হাত কেটে নিয়েছে তাতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে কেরল একটি 'মুসলিম দেশে' পরিণত হবে।'' প্রসঙ্গত যে ঘটনার কথা ইঙ্গিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন, সেটি 'স্বস্তিকা'র ১৯ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যাদের কীর্তিকলাপের দিকে তাঁর আঙুল সেই পপুলার ফ্রন্ট অব্ ইন্ডিয়ার মৌলবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে ২৬ জুলাইয়ের 'স্বস্তিকা'য় বেশ ফলাও করেই প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই কোনও নতুন ঘটনা নয় এবং কেরল সরকার যে এই ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছে এমনও নয়। কিন্তু সিপিএম পার্টির ফাঁসটা সরকারের ওপর বেশ ভালভাবে চেপে বসেছে। সিপিএমের 'বেঙ্গল লাইনে'র মতোই কারাটের কাজকর্মের ঘোর বিরোধী কেরলের মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় শৃঙ্খলা অমান্য করার জন্য কারাট পলিটব্যুরো থেকে এক প্রকার ঘাড়ধাক্কাই দিয়েছিলেন অচ্যুতানন্দনকে। বর্তমানে অচ্যুতানন্দন যেভাবে মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাতে পার্টির বেঙ্গল লাইনের ভাষায় 'কাঠ গোঁয়ার' প্রকাশ কারাট এবার তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবেন বলে মনে করছে না পার্টিরই একাংশ। কারণ 'বেঙ্গল লাইনে'র জন্য কারাট চাপে রয়েছে বলেই নয়, কেরলের 'মুসলিম আগ্রাসন'-এর নির্মম বাস্তবতাও অন্ধ বিজেপি বিরোধী ও 'সেকুলার' কারাটকে স্বস্তি দিচ্ছে না।

হাসপাতালে আহত যোশেফ।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পি এফ আই)-র উদ্দেশ্যে স্পষ্টই বলেছেন, ''তাদের (পি এফ আই) পরিকল্পনাই হলো কেরলে মুসলিম সমাজকে অন্যান্য সমাজের তুলনায় বৃহত্তম করে তোলা। আগামী ২০ বছরের মধ্যে তারা এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। একাজের জন্য টাকার বিনিময়ে যুব সমাজকে কিনে নিচ্ছে তারা।'' অচ্যুতানন্দ যেদিন এমন কথা বলছেন ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ২৩ জুলাই প্রকাশ কারাট সরাসরি আক্রমণ করেছেন পি এফ আই-কে। মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি না করলেও পি এফ আই-কে তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের যোগসূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

তবে এই পি এফ আই-কে নিয়ে কেরলে রাজনৈতিক তামাশা বেশ ভালভাবেই জমে উঠেছে। সেখানকার কংগ্রেসী নেতৃত্ব অনেকটা পি এফ আই-এর ঢঙেই অভিযোগ করেছে যে সিপিএম ইচ্ছাকৃতভাবে কেরলের মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, সেপ্টেম্বরে আসন্ন পঞ্চায়েত ও পুরভোট এবং হাতে একবছরও সময় না থাকা আসন্ন বিধানসভা ভোটের তাগিদে এখন থেকেই মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক তুষ্ট করার কাজে মন দেবে কংগ্রেস। আর তাতে মৌলবাদী সন্ত্রাসের আশঙ্কাই বাড়বে।

কেরলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অচ্যুতানন্দনের কাছে যা রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতে মৌলবাদী সন্ত্রাসের আশঙ্কার কথাই বলা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে মৌলবাদীদের প্রকাশ্য সংগঠন যা পূর্বে এন ডি এফ নামে পরিচিত ছিল, সেটা মুসলিম যুবকদের জেহাদী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করছে। সেইসঙ্গে তারা (পড়ুন পি এফ আই) গত স্বাধীনতা দিবসের দিন 'ফ্রিডম প্যারেড'-এ অংশগ্রহণ করে একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে প্রশাসন ও জনগণের কাছে। এ প্রসঙ্গে অচ্যুতানন্দন জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র দফতরের গোপন রিপোর্ট পেয়ে গতবার সরকারের অনেকগুলো জেলাতে প্রশাসন পি এফ আই-এর প্যারেড বন্ধ করে দেয়।

কলেজের লেকচারার টি জে যোশেফের হাত মৌলবাদীরা কেটে নেবার পরেই টনক নড়ে রাজ্য প্রশাসনের। যোশেফের অপরাধ ছিল কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশ্নপত্র তৈরির সময় মহম্মদ নামক চরিত্রটি ভুলবশত 'ম্যাড ম্যান' হয়ে যায়। আর এই লঘু অপরাধেই পি এফ আই কর্মীদের দ্বারা চরমতম দণ্ডের শিকার হন তিনি। ঘটনার নিন্দায় মুখর হয়েছে সারা দেশ-ই। এমনকী মুসলিম তোষণকারী সিপিএমও এনিয়ে সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু কংগ্রেস আর তার সহযোগী সংবাদপত্রগুলি (বিশেষত বাংলার)। তারা এহেন মারাত্মক ঘটনাটিকে শুধু চেপে গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, রটাচ্ছে গত লোকসভা ভোটে ঘা খেয়ে হিন্দু তাস খেলছে সিপিএম। যদিও সিপিএমের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু কংগ্রেসের ভূমিকাটা এনিয়ে এতই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিককালে যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে 'মুসলিম দেশ'-এর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের এই আশঙ্কাকে আরও স্পষ্ট করেছে বাংলার মাটিতে মুর্শিদাবাদে একটি রাজ্য সরকারের লেটার-হেডে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষে স্বাক্ষর করা হয়েছে 'মুসলিমাবাদ'-এর নামে। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ যে আসলে মুসলিমাবাদ তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদ সিপিএমের অথচ জেলার তিনজন সাংসদ-ই কংগ্রেসের। ওই সাংসদদের মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ও রয়েছেন। বোঝাই যায়, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মদতে সিপিএমের রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের এই 'দেশবিরোধী কর্মযজ্ঞ'। প্রশ্ন কেবল দু'টো, দেশের স্বার্থ বিপন্ন করে সোনিয়া মাইনোর কংগ্রেস কতদিন আর মুসলিম তোষণের খেলা খেলবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কেরল সিপিএমের সরকার মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া হতে পারলে এরাজ্যের সিপিএম সরকার তা পারছে না কেন? বুদ্ধবাবুর প্রশাসন কি এতটাই অযোগ্য? না কি মমতার সঙ্গে মুসলিম তোষণে 'কমপিট' করাটাই এখন বিমানবাবুদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা?

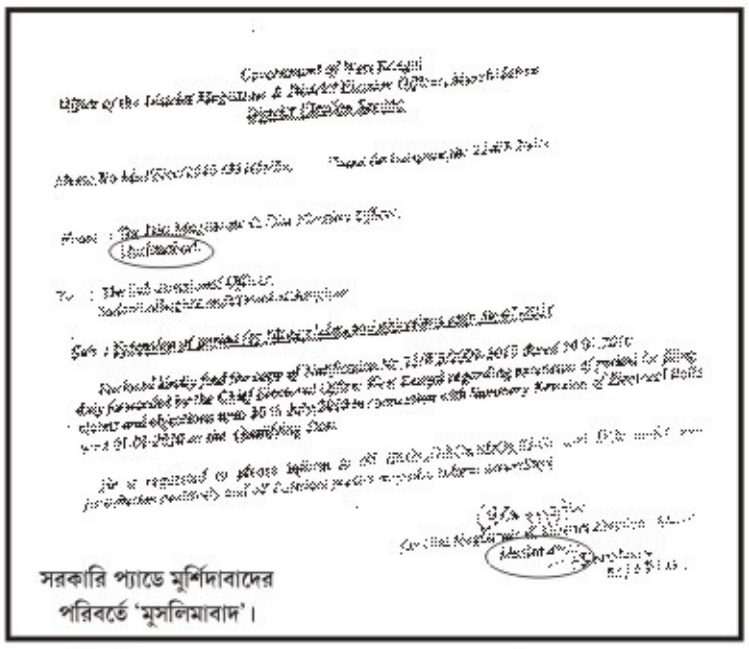

সরকারি প্যাডে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে 'মুসলিমাবাদ'।

হতদরিদ্র ভারতের ছবি ইউ এন ডি পি-র রিপোর্টে

সংবাদদাতা।। ভারতের ৫৫ শতাংশ বাসিন্দাই খাদ্য সংকটের শিকার বলে দাবি করল ইউনাইটেড নেশান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ডি পি)। সম্প্রতি, ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগ দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের জীবন ধারণের উপর একটি সমীক্ষা চালায় ইউ এন ডি পি। সেই সমীক্ষায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। সেটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটকের মতো সমৃদ্ধ রাজ্যগুলিতেও প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের শিকার। একমাত্র কেরলে পরিমাণটা আনুমানিকভাবে কম। ইউ এন ডি পি এই তথ্যটি প্রকাশ করে দৈনন্দিন জীবনের ১০টি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। যেমন— শিশু জন্ম-মৃত্যুর হার, সাক্ষরতার হার, পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় জল, সঠিক বাসস্থান, স্বাস্থ্য সচেতনতা, রান্নার গ্যাস, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, এবং আনুষঙ্গিক পরিবেশ। এইসব বিষয়ে সমীক্ষা করে জানা যায়, প্রায় ২০ শতাংশ মানুষই দশটার মধ্যে ছ'টা উপাদান থেকেই বঞ্চিত। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সমস্যাই হচ্ছে অপুষ্টি জনিত। প্রায় ২০ শতাংশ শিশু বর্তমানে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে তারা রোগে পড়ছে এবং কেবল মাত্র ৫ শতাংশ ভুগছে পানীয় জল জনিত সমস্যায়। মাল্টি ডাইমেনশানাল প্রভার্টি ইনডেক্সের (এম পি আই) তথ্য অনুয়ারী, ভারতে অন্নসংকটের বহুমুখী দারিদ্র্য সূচক সমস্যা মূলত তফসিলভুক্ত মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। প্রায় ৮১.৪ শতাংশ মানুষ এই সমস্যার শিকার।

দেশের গরীব রাজ্যের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের থেকেও বিহারকে আগে দাঁড় করিয়েছে এম পি আই। বিহারের প্রায় ৮১.৪ শতাংশ বাসিন্দাই দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে, প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিহারে প্রায় ৪১.৪ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৩২.৮ শতাংশ বাসিন্দাই দারিদ্র্যের শিকার। তবে দেশের এই দারিদ্র্যের অন্ধকার যে পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করেছে এ ব্যাপারেও যথেষ্ট তথ্য সামনে এনেছে ইউ এন ডি পি। ইউ এন ডি পি তাদের এই সমীক্ষাটি চালায় মূলত তিনটি জেলার উপর—উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও উত্তর দিনাজপুর। রিপোর্ট অনুসারে উত্তর চব্বিশ পরগণায় প্রায় ৩২.৮ শতাংশ মানুষ দু'বেলা ঠিক ভাবে খাদ্য পান না। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরই বাসস্থান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও একটা আশঙ্কা থাকে দক্ষিণ চব্বিশপরগণায়। ২০০২ সালের একটি তথ্য অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ৪৭.৬ শতাংশ জনজাতিই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।

চিঠিপত্র

সর্দার প্যাটেল

২রা শ্রাবণ (১৯.৭.১০) সংখ্যায় দুজন শ্রদ্ধেয় পাঠক আমার দুটো নিবন্ধ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। একজন সামান্য প্রাবন্ধিকের লেখা তাঁরা খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং সেই নিয়ে লিখেছেন, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

শ্রী রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় মশায় মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপার নিজে কিছু তথ্য যুক্ত করেছেন। এতে আমি যেমন উপকৃত হয়েছি, অন্যরাও নিশ্চয় তেমনি উপকৃত হবেন। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু আমার প্যাটেল সংক্রান্ত লেখাটা নিয়ে বিমলেন্দু ঘোষের বক্তব্য ঠিক বুঝলাম না। শ্রদ্ধেয় ঘোষ মশায় জানিয়েছেন, আমার অভিযোগের সমূহ আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। অথচ তিনি অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা লিখে লেখাটার কলেবরটা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, প্যাটেল ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর অনশনের সময় এটাকে তাঁরই বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসেবে ধরে নিয়ে 'একবার' মন্ত্রীত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে জানাই—আরও একবার তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার কথা ভেবেছিলেন।

সকলেই জানতেন যে, তাঁর সঙ্গে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন আচার্য কৃপালনী ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ। তখন কিন্তু প্রথমজনকে নেহরুর ও দ্বিতীয়জনকে প্যাটেলের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল—'The contest was represented as a contest between Sardar Patel and Jawaharlal'—(এম. চলাপতি রাউ—জওহরলাল নেহরু, পৃঃ ২০৬)। পন্থ জয়ী হলেও তাঁকে নেহরুর চাপে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

এই দ্বন্দ্বটা ছিল স্বাভাবিক। একটা সময় প্যাটেল পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল—প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সর্বেসর্বা নন—তাঁকে ক্যাবিনেটের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে (সর্দার প্যাটেল'স্ করেস্পণ্ডেন্স্, ষষ্ঠ খণ্ড)। কিন্তু নেহরু লিখেছিলেন—এটা ঠিক যে, ক্যাবিনেটই হলো ক্ষমতা কেন্দ্র, কিন্তু তাতেও প্রধানমন্ত্রীর একটা অনন্য ভূমিকা আছে—'But in the type of democratic set-up that we have adopted, the Prime Minister is supposed to play an outstanding note'—(উদ্ধৃত এন. এস. গেলট—'পোজিশান অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার', দ্য মডার্ন রিভিউ, জুন, ১৯৭৯)।

এই বিরোধের ফলে নেহরু সরে যেতে চেয়েছিলেন—(এন. ভি. গ্যাড্‌গিল—গভর্নমেন্ট ফ্রম ইন্‌সাইড, পৃঃ ১৪২)।

কিন্তু এই সময় প্যাটেলও ক্যাবিনেট থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীকে এই ইচ্ছের কথা তিনি জানিয়েছিলেন। অবশ্য গান্ধীজী তাঁকে নিরস্ত করেছেন—কারণ দেশের পক্ষে সর্দার প্যাটেল ও নেহরু উভয়েরই দরকার ছিল—(কৃষ্ণ কৃপালনী—গান্ধী ঃ এ লাইফ, পৃঃ ১৯৫)।

কিন্তু এগুলো আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে ছিলই না। যেমন ছিল না প্যাটেলের মাহাত্ম্য-গাথা। তিনি তাঁর দাদার জন্য স্বার্থত্যাগ করেছেন—এই প্রসঙ্গটা এই চিঠিতে কেন? আমার লেখার বিষয়টা ছিল দেশভাগে প্যাটেলের ভূমিকা। শ্রদ্ধেয় পত্র লেখক আরও লিখেছেন—১৯৪৬ সালে তাঁর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু গান্ধীজী নেহরুকে পদটা দিয়েছিলেন।

এতে প্যাটেল নীরব থাকলেও, এটা তাঁর মহত্ত্ব কিনা জানি না। গান্ধীজীই সভাপতিকে মনোনীত করতেন—এটাই ছিল কংগ্রেসী গণতন্ত্র। ১৯৩৯ সালে সুভাষ এই রীতি ভাঙতে গিয়ে প্যাটেল গান্ধীদের দ্বারা কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন নিশ্চয় তা ভুলে যাননি।

তবে আবার বলি—এগুলো আমার প্রবন্ধের বিষয়ই ছিল না। প্রশ্নটা ছিল দেশভাগের ব্যাপারে প্যাটেলের ভূমিকা নিয়ে।

প্রথমত, একটা বৈঠকেই মাউন্টব্যাটেন কিন্তু প্যাটেলকে ধরাশায়ী করেছিলেন। প্যাটেল পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন আগেই—বড়লাট বলেছেন; তাহলে প্যাটেল নীতিগতভাবে দেশভাগের বিরোধী নন। তাছাড়া লীগের সঙ্গে অস্থায়ী ক্যাবিনেট কাজ করাটা প্যাটেলের পক্ষে সুখকর নয়—সেক্ষেত্রে দুপক্ষের আলাদা থাকাই উচিত। তাছাড়া এতে কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তর অংশকে ইচ্ছেমতো গড়তে পারবে।

এই তিনটে যুক্তিতেই প্যাটেল ঘায়েল হয়ে গিয়েছিলেন। মৌলানা আজাদ লিখেছেন, "It must be placed on record that the man in India who first fell for Lord Mountbattan's idea has Sardar Patel"—(ইন্ডিয়া উইথ্ ফ্রীডম, পৃঃ ৯৭)।

দ্বিতীয়ত, এরপরে প্যাটেলের কাজ হয়ে উঠেছে অন্ধ নেতাদের দেশভাগের ব্যাপারে রাজী করানো। বিশেষ করে, তিনি গান্ধীজীকেও স্বমতে টেনেছেন। আজাদ লিখেছেন, প্যাটেল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার পর গান্ধীজীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। আর তারপরেই গান্ধীজী দেশভাগের পক্ষে কথা বলা শুরু করেছেন এবং প্যাটেলের যুক্তিগুলোই তুলে ধরেছেন।

তৃতীয়ত, ৩১ জুলাই বড়লাট যে সর্ব-দলীয় বৈঠক ডেকেছেন, তাতেও প্যাটেল দেশভাগের ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। একবারের জন্যও তিনি দ্বিধা দেখাননি।

চতুর্থত, ৩ জুন ওয়ার্কিং কমিটি সেটা মেনে নেয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (জুন, ১৪-১৫) সেটা ১৫৭/২৯ ভোট গ্রহণ করে—৩২ জন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন—(ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৯৫)। প্যাটেল বিরুদ্ধে ছিলেন না বা নিরপেক্ষও থাকেননি। বরং তিনি দেশভাগের পক্ষেই জোরালো ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—দেশভাগ মেনে না নিলে 'The whole of India will be turned into pakistan'—(উদ্ধৃত, বিষ্ণু প্রভাকর—সর্দার প্যাটেল, পৃঃ ৬৩)। বলা বাহুল্য, তাঁকে নরম করার ফলেই বড়লাট এই ব্যাপারে এগিয়েছিলেন—'with the acceptance of this position by the Sadar, Lord Mount Batten proceaded further'—(আই. জে. প্যাটেল— সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃঃ ১৪৭)। সুতরাং দেশভাগের ব্যাপারে তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল।

আমার বক্তব্য ছিল এগুলোই। প্রশ্ন হলো—শ্রীঘোষের এই ব্যাপারে ভিন্ন মত আছে কি?

—নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত, বাঘাযতীন, কলকাতা।

প্রসঙ্গ মোহনবাগান

২৬ জুলাই সংখ্যার 'চেনা মোহনবাগান, অচেনা মোহনবাগান' প্রসঙ্গে এই পত্র। ১৯০৫ সাল নয়, ১৮৯২ সালে চুঁচুড়ায় গ্ল্যাডস্টোন কাপ ফাইনালে মোহনবাগান প্রথম হারায় ডালহৌসিকে ৬-১ গোলে। ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে মোহনবাগান কুচবিহার কাপ জেতে। এক প্রদর্শনী ম্যাচে তৎকালীন শীল্ড বিজয়ী ক্যালকাটাকে হারিয়ে টানা তিনবার ট্রেডস কাপ জিতে মোহনবাগান হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। এটাই ছিল তখন কোনও ভারতীয় দলের সেরা সাফল্য। মোহনবাগান প্রথম শিল্ড খেলে ১৯০৮ সালে। কিন্তু ১৯১১ সালের ইতিহাস আজও গৌরবময় ঘটনার সাক্ষী। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগান হারায় ইস্ট ইয়র্ক রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে। একগোলে পিছিয়ে থেকেও মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম গোল করেন শিবদাস ভাদুড়ী এবং খেলা ভাঙার ছয় মিনিট পূর্বে জয়সূচক গোলটি করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ।

সেদিন খালি পায়ে শুকনো খটখটে মাঠে মোহনবাগান অসাধারণ খেলেছিল। মাঠে হাজির ছিলেন প্রায় ৭০ হাজার দর্শক। সেটাই ছিল সেকালে কোনও খেলার সর্বাধিক দর্শক। যাঁরা খেলা দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাঁদের জন্য ঘুড়ি উড়িয়ে খেলার ফল জানানোর ব্যবস্থা হয়। সেদিনকার আনন্দে শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই বের হয়েছিল বিজয় মিছিল। বস্তুত সেটাই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম জয়। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন—

জেগেছে আজ দেশের ছেলে
পথে লোকের ভিড়
অন্তঃপুরে ফুটল হাসি
বঙ্গ রূপসীর।
আজিকার এই বিজয় বাণী
ভুলবে নাকো দেশ
সাবাস সাবাস মোহনবাগান
খেলছ ভাই বেশ।।

—ব্রহ্মানন্দ ঘোষাল, ধামসিয়া, হাওড়া।

সংস্কৃত ভাষা

১২ জুলাই, ২০১০ স্বস্তিকায় 'আমাদের সবার ভাষা সংস্কৃত' প্রতিবেদনটি পড়ে খুব ভাল লাগল। দেশভাগের পর জওহরলাল সমগ্র ভারতে কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে তা নিয়ে একটি ভাষা কমিশন বসিয়ে ছিলেন যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ভাষা বিশারদ ডঃ সুকুমার সেন। দীর্ঘ সময়ে সেই কাগজ পত্র হারিয়ে যাওয়ায় যতদূর মনে পড়ছে তা সংক্ষেপে লিখছি।

জওহরলাল নেহেরুর ইচ্ছা ছিল উর্দু ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হোক। ইহার গ্রহণ যোগ্যতা না পেয়ে তিন রোমান হরফে লিখে হিন্দুস্তানি ভাষাকে (উর্দু আর হিন্দি মিশালি ভাষা) রাষ্ট্র ভাষা করার ইচ্ছা করেন। ইহাও ভারতীয়দের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা পায় না। ভাষা কমিশনে তখন এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতের কোন ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করা যায় (Lingua Franca) এই নিয়ে ভোটাভুটি হয়। ভোটের ফলে দেখা যায় সংস্কৃত ও হিন্দি সমসংখ্যক ভোট পেয়ে সবার শীর্ষে। জওহরলাল তখন ডঃ সুকুমার সেনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সভাপতির casting vote হিন্দির পক্ষে দেওয়ান। একটি মাত্র casting vote-এর জোরে হিন্দি সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা পায়।

এর ফলে কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ভারত হিন্দিকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারেই নি বরং যতদূর সম্ভব বিরোধিতা করেই চলেছে। পূর্ব ভারত যদিও তেমন বিরোধিতা করছে না, তবে পূর্ব ভারত হিন্দির বদলে ইংরাজীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

আরও একটি আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হলো হিন্দির প্রভাবে প্রদেশের ভাষাগুলির স্ফুরণে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে যা ইংরাজীর সাথে কখনও হয়নি। সংস্কৃত যদি Lingua farance হোত, তবে এই ভাষার বিদ্বেষ এতটা হোত না এবং আমরা সংস্কৃতের বিশাল ভাষা সম্ভার নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে পারতাম।

—বারিদ বরণ গুহ, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা।

জনমত

হম দো হামারা দো

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়।। সম্প্রতি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হলো বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। তাতে বক্তব্য—আসুন, আমরা পরস্পর হাত মেলাই জনসংখ্যা অপরিবর্তিতকরণে। অপরিবর্তিতকরণ (stabilisation) শব্দটি তেমন অর্থবহ নয়; অর্থবহ শব্দ নিয়ন্ত্রণ (control)। কিন্তু বিজ্ঞাপনে শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ভারতের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১১৮ কোটি। ২০৩০ নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা চীনের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, চীন গুরুত্ব সহকারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে একটির বেশী সন্তান উৎপাদন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। পক্ষান্তরে ভারতের অবস্থা অতি করুণ। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই জনসংখ্যা ২১ কোটিতে পৌঁছবে আগামী বছরে—যা ব্রাজিলের জনসংখ্যার সামান্য কম। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্রাজিলের আয়তন ভারতীয় উপমহাদেশের থেকে অনেক বেশী। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি জনসংখ্যার এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ সম্পর্কে নীরব থাকাই নিরাপদ মনে করে। তাদের কাছে দেশের ভবিষ্যতের চেয়ে ক্ষমতা দখল ও তা ধরে রাখা জরুরী। তারা এমন কোনও আইন করতে কখনওই রাজী হবে না, যে দুটির বেশী তিনটি বাচ্চা হলে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। কিন্তু এমন দিন অচিরেই আসবে যখন বাইরের দেশ থেকে ব্যাপকভাবে খাদ্য কিনতে হবে ভারতের জনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, পার্লামেন্ট কেন সমস্যা সমাধানকারী আইন আনতে পারবে না? এর উত্তর, পবিত্র ভোটাররা তাতে বিগড়ে গিয়ে বলবে আমাদের ধর্মে হাত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ধর্মের সরাসরি যোগ নেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা মানুষের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। 'খণ্ডিত সুরত' জন্ম নিয়ন্ত্রণের অতি প্রাচীন পদ্ধতি। সপ্তম শতাব্দীর আরবে এর প্রয়োগ যে ছিল তা সহী মুসলিম হাদিশ থেকে জানা যায়। বিংশ শতাব্দীতে মার্গারেট স্যাঙ্গার জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ভারতে এসে জাতির জনকের নিকট উপস্থিত হলে মহাত্মা তাঁকে বলেছিলেন, ভারতের নারীরা নিজেদের ইচ্ছা দমন করতে পারে। তাদের জন্য কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন নেই। ভেরিয়ের এল্যুইন এ ব্যাপারে বাপুর কুসংস্কারের কথা বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সবরমতী আশ্রমে অল্পবয়সী দম্পতিদের ভাই-বোনের মতো থাকতে বলতেন বাপু। তারা প্রায়শই সে নিষেধ মানতো না—স্বামী-স্ত্রী হয়ে যেতো। তখন তাদের দণ্ডিত করতেন বাপু। একদিন ভেরিয়ের সমুদ্রের ধারে এক বাসভবনে ম্যাডেলিন স্লেডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন মিস স্লেড সব জানলা বন্ধ করে দিয়ে বসে আছেন। কারণ, বাপু বলেছেন লবণ কাম উদ্রেক করে। জানলা খোলা থাকলে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় লবণ উড়ে আসবে। সুতরাং স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, যদিও রবীন্দ্রনাথ স্যাঙ্গারকে সমর্থন করেছিলেন। দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন রাজকুমারী অমৃত কাউর হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। কাজে কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী। সুতরাং অমৃত কাউরের যুগের অবসানের পরেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেশ। তখন ধ্বনিত হলো, তিনটির বেশী সন্তান নয়। কোনও এক কবি এর প্রতিবাদে কবিতা লিখলেন, চতুর্থ সন্তান তুমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। তারপর গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ধ্বনি উঠলো, হম দো, হমারা দো। এই ধ্বনির বশবর্তী হয়ে জরুরী অবস্থার সময় সঞ্জয় গাঁধী জোর করে বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে ভ্যাসেক্টোমী করালেন। জনমানসের পৌরুষে আঘাত লাগলো এর ফলে। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হলেন ইন্দিরা ও সঞ্জয়।

এতৎসত্ত্বেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরন্তর উপদেশ দিচ্ছিলেন দম্পতিদের। জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা উপকরণ সরবরাহ করছিলেন। ভ্যাসেক্টোমী ও লাইগেশনের জন্য কিছু টাকাও দেওয়া হচ্ছিল হাতে। এইসব প্রচার ও উদ্যোগের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেউ উৎসাহিত হচ্ছিল, কেউ হচ্ছিল না। বাধাও যে আসেনি বা আসছে না তা নয়। অনিতা দেওয়ানের শোচনীয় মৃত্যু আমরা ভুলতে পারি না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জন্মহার বৃদ্ধি লাগাম ছাড়া— জনগণের এক বৃহৎ অংশ জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী নয়। অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসার দৌলতে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। এই সংকটজনক অবস্থাতেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও আইন করা যাবে না। কিছুদিন আগে হরিয়ানা সরকার স্থির করে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচনের জন্য মহিলা প্রার্থীদের তিনটির বেশী সন্তান থাকলে চলবে না। এতে শাবানা আজমী প্রতিবাদ করে বললেন, এই ধরনের আইনে নারীর অধিকার সাধারণভাবে ক্ষুণ্ণ করা হবে। আবার এই হরিয়ানাতেই এক মুসলিম রমণী ২৩টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে পুরস্কৃতও করেছে মুসলিম সমাজ। কিন্তু তাঁর স্বামী সামান্য একজন দিনমজুর। সুতরাং এটা স্পষ্ট, ভারত একটা নরম রাষ্ট্র; আইন করে হাম দো, হমারা দো করা যাবে না। ভারতের বিচিত্র জনপ্রকৃতির কারণে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক বিভীষিকাময় ভারতের ছবি রেখে যাচ্ছি।

ষোড়শ মহাজনপদ

গোপাল চক্রবর্তী

জনপদ। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চ ল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি জনপদ। কাশী কোশল মগধ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এরকম আরও কত কী। ভারতবর্ষে এইরকম ৬০টি জনপদ ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। স্থানীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল জনপদগুলির ভিত্তি।

এইরকম ষোলটি জনপদের কাহিনী নিয়ে আমাদের নিবেদন—ষোড়শ জনপদ।

মগধ

প্রাচীন মগধ বলতে দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা বোঝাত। এর উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের শাখা, পূর্বে চম্পানন্দী ও পশ্চিমে শোণ নদী। মহাভারতের জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ মগধের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মৎস্য -পুরাণে বলা হয়েছে মগধের আদি রাজবংশ শৈশুনাগ। রাজা বিম্বিসার এই বংশোদ্ভুত ছিলেন। বৌদ্ধ মহাবংশ ও অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত'-এ বলা হয়েছে যে মগধের প্রথম বিখ্যাত রাজা বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশের সন্তান। মগধের উত্থান হর্যঙ্ক বিম্বিসারের আমল থেকেই আরম্ভ হয় এমন প্রমাণ বহুভাবে পাওয়া যায়। বিম্বিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টীয়।

বিম্বিসার যখন মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মগধ ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। ইতিহাসে দেখা যায় ব্যক্তি ও পরিস্থিতির মিলন হলে বহু পরিবর্তন ঘটে। মগধের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গঙ্গার তীরে মগধ ছিল খুবই উর্বরা। জনবহুল শস্য শ্যামলা সমৃদ্ধ অঞ্চ ল। গঙ্গা ও শোণ মগধের মাটিকে করেছিল সুজলা সুফলা। গঙ্গার জলধারায় বয়ে চলত মগধের বাণিজ্যতরী। মগধের অরণ্য থেকে আসত জাহাজ তৈরির উপযুক্ত কাঠ। মগধের খনি থেকে আসত অফুরন্ত লোহা। যা দিয়ে তৈরি হতো যুদ্ধের অস্ত্র, কৃষি ও গৃহস্থালীর সরঞ্জাম এবং বাড়তি লোহা রপ্তানী করে আসত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। ঐতিহাসিকরা এই খনিগুলিকে মগধের সামরিক শক্তির গর্ভগৃহ বলেছেন। মগধের সামরিক শক্তি গড়ে উঠেছিল মূলত হস্তি বাহিনীর উপর। বিন্ধ্যপর্বত থেকে হাতি ধরে তাদের পোষ মানিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশাল হস্তিবাহিনী তৈরি হয়েছিল। এই পরম্পরা নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক পর্যন্ত চলেছিল। এভাবে মগধের উন্নতির ক্ষেত্র তৈরি হলে বিম্বিসার ইতিহাস

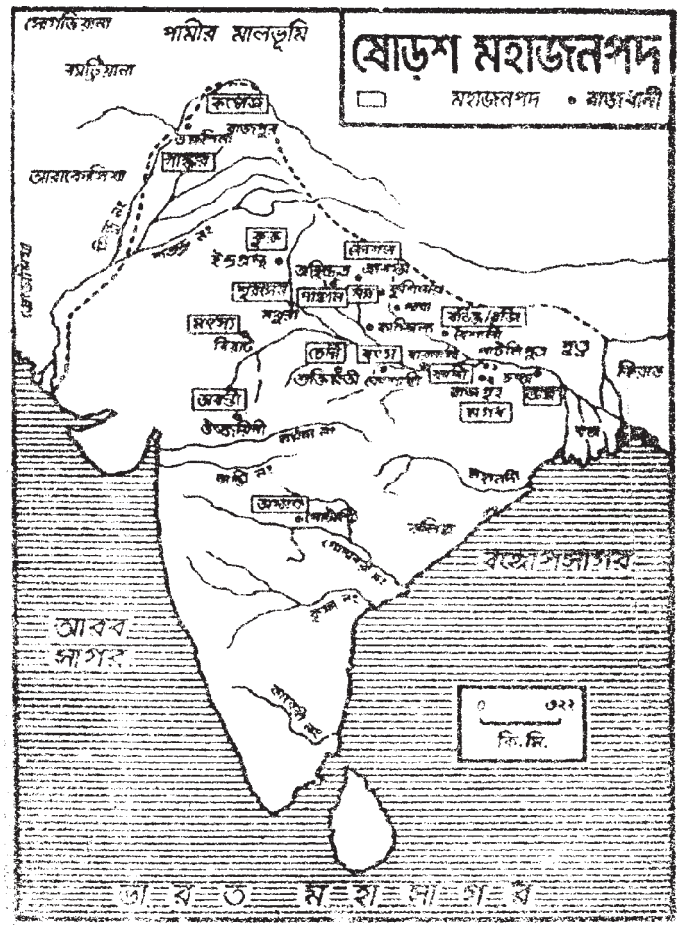

প্রেরিত নেতা রূপে মগধের বিস্তার নীতির বীজ বপন করেন। বিম্বিসার কোশলরাজ মহাকোশলের কন্যা কোশলদেবীকে বিবাহ করে কাশী নগরটি যৌতুক হিসাবে লাভ করেন। আবার লিচ্ছবী, বিদেহ এবং মদ্র রাজকন্যাদের বিবাহ করে সামাজিক ও সামরিক প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেন।

এরপরেই বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য আক্রমণ এবং জয় করেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে "অঙ্গ রাজ্য আক্রমণ দ্বারা বিম্বিসার মগধের রাজ্যবিস্তারের যে সূচনা করেন অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। অঙ্গের চম্পা বন্দর অধিকারে আসায় মগধের বাণিজ্য সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদের দ্বারা বিম্বিসার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি স্থাপন এবং সেনা সংগঠন করতে পেরেছিলেন। তিনি গান্ধার ও তক্ষশিলার রাজার নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। অবন্তী রাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য তিনি রাজবৈদ্য জীবককে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর আমলে গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত।

বিম্বিসার বুদ্ধের শরণাগত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘকে বসবাসের জন্য করণ্ড বেণুবন নামে একটি উদ্যান দান করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে বিম্বিসার তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হন। খৃঃ পূঃ ৪৯৩ অব্দে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসেন। বিম্বিসার পুত্রের হাতে নিহত হলে কোশলদেবী স্বামীশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ভগিনীর অকালমৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রসেনজিৎ যৌতুক হিসাবে যে কাশীগ্রাম দেওয়া হয়েছিল তা পুনর্দখল করেন। এজন্য অজাতশত্রু তার মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কোশল মগধের যুদ্ধে কোশলরাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তাঁর কন্যা ভজিরা কুমারীকে অজাতশত্রুর সঙ্গে বিবাহ দেন এবং কাশীনগর অজাতশত্রুকে যৌতুক হিসাবে দান করেন। আসলে গঙ্গার উপর আধিপত্য নিয়ে মগধ কোশলের লড়াই হয়।

বৌদ্ধ জাতকে বলা হয়েছে যে, গঙ্গার উপর একটি খনির অধিকার নিয়ে মগধ ও লিচ্ছবির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক বাসাম বলেছেন যে গঙ্গার দুই উপকূলের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং

(এরপর ১৪ পাতায়)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ ও ইসকনের কথা

রবীন সেনগুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দর দেহত্যাগের ঠিক পূর্বেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের জন্য তিন তিন জন মহাশক্তিশালী ধর্মীয় ও স্বদেশপ্রেমী সত্ত্বাকে প্রেরণ করেন। তার মধ্যে একজন হলেন ডাঃ কেশব হেডগেওয়ার, দ্বিতীয় জন হলেন স্বামী প্রণবানন্দ ও তৃতীয় জন হলেন শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীল প্রভুপাদ হলেন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ভক্তিধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীল প্রভুপাদ সবচেয়ে অধিক বয়সে ধর্ম প্রচারার্থে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করে সফল হন। সত্তর বছর বয়সে হার্টের ব্যাধি যুক্ত যে কোনও ব্যক্তি যখন কর্ম ত্যাগ করেন বা কমিয়ে দেন শ্রীল প্রভুপাদ সেই বয়সে নুতন করে মহাপরিশ্রমের ও মহাঝুঁকিবহুল কর্ম যে কি করে শুরু করলেন ও সফল হলেন— সে এক অলৌকিক ব্যাপার।

প্রভুপাদের গৃহস্থ জীবনের নাম ছিল শ্রী অভয়চরণ দে। তিনি কলকাতার এক বস্ত্র বিক্রেতার গৃহে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে জন্মানোয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে রথযাত্রার আয়োজন করে ধর্মীয় আগ্রহের ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। প্রভুপাদ লেখাপড়ায় মেধাবী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজীর অনুগামী হিসাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর তাঁর বয়স যখন ছাব্বিশ সেই সময় কলকাতার একটি বাড়িতে তৎকালীন প্রখ্যাত বৈষ্ণব গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। শ্রীল সরস্বতী ছিলেন গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, সারা জীবনে ৬৪টি আশ্রম তিনি নির্মাণ করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষায় ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য আগ্রহী করে তোলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে যতই স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হোক, মানুষের মনে ঈশ্বর ভক্তি না থাকলে এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত মূল্যবান জ্ঞান না থাকলে সবই বৃথা হয়ে যাবে।

প্রভুপাদ এরপর টানা এগারো বছর শ্রীল

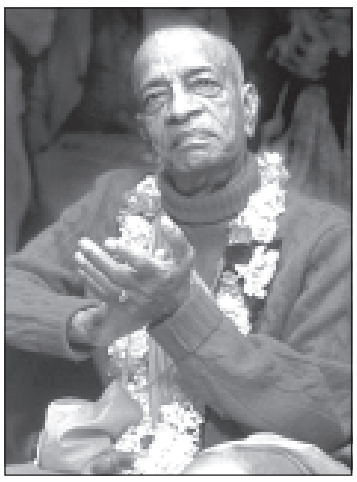

সরস্বতীর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। পরিশেষে ৩৭ বছর বয়সে তিনি প্রয়াগে গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা পান। ইতিমধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ সংসার যাত্রা ও কেমিক্যালের ব্যবসা করার ফাঁকে ফাঁকে ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনধামের রাধামাধব মন্দিরে অবস্থান করে তিনি শ্রীমদভাগবতের ব্যাখ্যা সহ ইংরাজী অনুবাদ করেন। এক ভক্তের দানে কোনওক্রমে জাহাজ ভাড়া জোগাড় করে ১৯৬৫ সালে উনসত্তর বছর বয়সে তিনি প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় নিউইয়র্কে অবতরণ করেন। সমুদ্র পথে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। তবুও রাধাকৃষ্ণের নাম জপতে জপতে তিনি আমেরিকায় তাঁর কাজ শুরু করে দেন। টম্পকিন স্কোয়ারের পার্কে এবং নানা স্থানে প্রভুপাদ শ্রীখোল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন। তাই দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হতে থাকেন। টানা একবছর কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি কয়েক হাজার আমেরিকাবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে গীতা শ্রীমদভাগবত ইত্যাদির দর্শনই সবচেয়ে মাধুর্যময় ও নিরাপদ। স্থায়ী সুখশান্তি লাভ করতে গেলে এই মার্গে জীবনধারা প্রবাহিত করাটা একান্ত জরুরী। আমেরিকার অনেক সাংবাদিক, নেশাগ্রস্ত বিপথগামী যুবক যুবতী, সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানী-গুণী বিখ্যাত মানুষ তাঁর কাছে নিয়মিত এসে প্রশ্ন করত, উত্যক্ত করত, ভালবাসত, অর্থ সাহায্য করত, কীর্তনে ও প্রসাদ খাওয়ায় অংশ নিত এমনকী মন্ত্র দীক্ষাও গ্রহণ করত। এইভাবে প্রভুপাদ অনেকের জীবনধারাই বদলে দিয়েছিলেন। অনেকেই হিন্দু নাম গ্রহণ করল, তিলক, নামাবলী, নিরামিষ আহার, মালাজপা এসবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। প্রভুপাদ-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে এইসব নবীন ভক্তের দল বিশাল শোভাযাত্রা, পত্র-পত্রিকা বিক্রয়, গীতা, ভাগবত ও প্রভুপাদের অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয় ব্যাপক হারে করতে লাগল। প্রভুপাদের ইচ্ছায় এই সংগঠনের নাম হলো ইন্টারন্যাশানাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস। বাংলায় নাম হলো আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। সংক্ষেপে ঢত্রট্রথত্ব (ইস্কন)।

স্বাভাবিক মানুষের সাথে সাথে বহু বিপথগামী মানুষও ইস্কনে যোগদান করায় সরকার ও অভিভাবকদের তরফ থেকে সাহায্যও আসতে লাগল। সাহায্যকারীরা ইতিপূর্বে বিপথগামী মানুষদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন, এই হরেকৃষ্ণ নামমন্ত্রের দৌলতে তারা মারাত্মক সব নেশার কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে দেখে প্রভুপাদের প্রতি অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। আবার ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে বাধাও আসছিল অনেক। কোর্ট কাছারিও করতে হয়েছে ইস্কনকে। যাইহোক, আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে ইস্কনের মুখ্য কেন্দ্র গড়ে উঠল। আমেরিকারই ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় নিউ বৃন্দাবন নামে এক বৈদিক ভিলেজ তা গড়ে তুলল প্রভুপাদের ভক্তরা। ভারত এসে তারা কৃষ্ণকীর্তন, গ্রন্থ, ক্যাসেট, প্রসাদ-ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে মায়াপুরে এক বিশাল আশ্রম গড়ে তুলল। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মুখ্য দেশে ও মুখ্য ভাষায় ইস্কনের আশ্রম ও পত্রিকা আজ বহুল প্রচারিত। ষাটটিরও অধিক ভাষায় ভাগবতদর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকাদুটি প্রকাশিত হয়। এতগুলি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ খুব কম কেন্দ্র থেকেই হয়ে থাকে। প্রভুপাদ অত বয়সে বারংবার অসুস্থ হয়েও সারা পৃথিবী প্রায় ১৪ বার পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে প্রভুপাদ যখন দেহত্যাগ করেন তখন ইস্কন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আর শুধু ভক্তিযোগ পরিষেবার ক্ষেত্রে ইস্কনকে অন্যতম বৃহৎ না বলে বৃহত্তম বলাটাই সমুচিত হবে। যদিও জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ পরিষেবার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির তেমন অগ্রগণ্য নয়। এই সব পরিষেবায় আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, পতঞ্জলি যোগপীঠ-এর মতো সংস্থাগুলি অনেক এগিয়ে তবুও ইস্কন ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির মূলত সাত্ত্বিক বৈষ্ণব দিকটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে ওর্য়াল্ড বৈষ্ণব অরগানাইজেশানকেও অতিক্রম করে গেছে। ত্রুটি বিচ্যুতি সব সংস্থারই থাকে। ইস্কনেরও তাই অনেক সমালোচনা হয়। আবার ইস্কনকে অনেকে ভুলও বোঝে। প্রভুপাদকে তাঁর নিজের রাজ্যতেই বহু লোক আজও চেনে না। আমরা অবশ্য রাধাকৃষ্ণের কাছে এই সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিদেশে নিখরচায় পঠন-পাঠন

।। নীল উপাধ্যায় ।।

স্কলারশিপ-১

উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা দিয়ে বা পাশ করে জাপানে উচ্চশিক্ষা করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করেছে জাপান সরকার। কোর্সগুলি করানো হবে জাপানি ভাষায়। পঠন-পাঠনের খরচ জাপান সরকারের। আবেদন করার শেষ তারিখ ৪ জুলাই। লিখিত পরীক্ষা জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে। এরপর ইন্টারভিউ। যোগাযোগ ওয়েবসাইটে ঃ www. studyjapan. go.jp

স্কলারশিপ-২

যেসব ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রেনিং সিস্টেম (আই আই এল টি এস) স্কলারশিপ চালু করেছে বৃটিশ কাউন্সিল। ভারত থেকে আটজন ছাত্রছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। বিশদে জানতে যোগাযোগ করতে হবে [illegible] ওয়েবসাইটে।

স্কলারশিপ-৩

ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্ডিয়া এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ২০১০-১১ সালের জন্য ফুলব্রাইট স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে। নাম হয়েছে ফুলব্রাইট নেহরু স্কলারশিপ অ্যান্ড গ্রান্ট। স্কলারশিপের সর্বমোট সংখ্যা ২৫০, যার অর্ধেক ভারতীয়দের জন্য। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ইকনমিক্স, এনভায়রনমেন্ট এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়তে আগ্রহীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীদের ফেলোশিপ হলো সর্বাধিক ন'মাসের একটি প্রিডক্টোরাল গবেষণার অনুদান। যাঁরা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পি এইচ ডি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং পেশাদারদের উল্লেখযোগ্য কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা এই ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। যাঁদের বয়স ২১-২৯ বছর এবং ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছেন, তাঁরা আমেরিকার ক্যাম্পাসে বাংলা হিন্দি গুজরাটি বা উর্দু পড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন ফুলব্রাইট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম থেকে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ের শিক্ষক, গবেষক ও অন্যান্য পেশাদারদের জন্য আরও অনেক স্কলারশিপ। বিস্তারিত জানতে, দেখতে হবে ওয়েবসাইট www.usief.org.in

ফুলব্রাইটের আবেদনকারীদের সাহায্য করার জন্য প্রাক্তন ফুলব্রাইট স্কলারদের নিয়ে কিছু আলোচনাসভা করার পরিকল্পনা করছে ইউসিয়েফ। যোগাযোগ ঃ ৩৮এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭১। ফোন ঃ ২২৮৮-১২০০।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ৪

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

বিকল্প মানব মস্তিষ্ক

মানব-মস্তিষ্কের বিকল্পও তৈরি করা সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয়, তৈরি হয়েও গিয়েছে। এই যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বাঙালি বিজ্ঞানী অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি দীর্ঘদিন ধরে জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব্ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনের সঙ্গে যুক্ত। বিকল্প মস্তিষ্ক হলো একটি অত্যাধুনিক সার্কিট, ঝাটতি সমাধান সূত্র বাতলে দেবে অনেক সমস্যার। এখন কম্পিউটার যা পারে না, ভবিষ্যতে এই বিকল্প মস্তিষ্ক তাই করবে। এর মধ্যে একটি অর্গ্যানিক মলিকিউলার স্তর থাকছে, যার নাম মনোলেয়ার। এটি বুদ্ধিমত্তার স্তর। মানব-মস্তিষ্কে একটি নিউরোন অকেজো হয়ে পড়লে পাশাপাশি আর একটি প্রাকৃতিক নিয়মেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই হবে।

সেলাম বাদাম !

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, খনিজ, ভিটামিন, অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট—কী নেই বাদামে! বাদামের গুণ নিয়ে কোনওকালেই সংশয় ছিল না মানুষের। সম্প্রতি তাতে সিলমোহর দিলেন বিজ্ঞানীরা। রোজের খাবারে বাদাম রক্তে কোলেস্টেরলের ভার কমায়।

ইলেক্ট্রনিক নোজ

ইজরাইলের টেকনিওন ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজির বিজ্ঞানী ডাঃ হোসাম হিক্স কার্বন দিয়ে 'ইলেক্ট্রনিক নোজ' নামে এমন এক ক্ষুদ্র সেন্সর তৈরি করেছেন, যা সহজে বাতাসে বিশ্লেষণ করতে পারে। কিডনির যে কোনও অস্বাভাবিকতার সঙ্গে এই 'নোজ' কিড্নির ক্যানসারকেও সনাক্ত করতে পারে। রোগীর ডায়ালিসিসের প্রয়োজন আছে কিনা তাও নিরূপণ করতে পারে এই নোজ। কিডনির বায়োপসি খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং এই পরীক্ষার সময় রোগীর দেহে যে-রক্তক্ষরণ ঘটে, ইলেক্ট্রনিক নোজের সেসব সমস্যাই নেই। হিক্স জানিয়েছেন, দেহের ক্ষতিকারক ২৭টি জৈব যৌগকে এই নোজ সনাক্ত করতে পারে।

রঙে রক্তপরীক্ষা

যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার ছাড়াই নিমেষে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, এতে খরচও নামমাত্র। গবেষণাগার ছাড়াই পরীক্ষা সম্ভব—বিশেষভাবে তৈরি কাগজের টুক্‌রোর রক্তের ফোঁটা ফেললেই কাগজের রঙ বদলে যাবে। বিশেষ রঙই রক্তের গ্রুপ জানিয়ে দেবে। এভাবে দ্রুত রক্ত পরীক্ষায় দ্রুত চিকিৎসা সম্ভব হবে, বাঁচবে বহু প্রাণ।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

স্ত্রী ঃ সকাল থেকে তোমার মোবাইল বাজছে আর কেটে যাচ্ছে। কারা এত ফোন করে?

স্বামী ঃ ওগুলো Miss Call!

স্ত্রী ঃ অবিবাহিত মেয়েরা তোমাকে ফোনই বা করে কেন?

* * *

গির অরণ্যে অমিতাভ বচ্চনকে দেখে—

সিংহী ঃ অ্যাই, চল্ ঘ্যাঁক্ করে গুরুর একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আসি।

সিংহ ঃ না। অমর সিংহের সঙ্গে গুরু যা ব্যাভার করেছেন সিংহ হয়ে তা বরদাস্ত করব না।

* * *

অমল ঃ জানিস, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমিই হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

কমল ঃ গুল মারিস না, ধৃতরাষ্ট্র হলে তুই স্বপ্ন দেখলি কী করে? ধৃতরাষ্ট্র তো অন্ধ ছিলেন।

* * *

পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রে লাঠি ঠকঠকিয়ে এসে এক বৃদ্ধা বললে ঃ ভোটবাবু, ইবার আমার ভোট তু দে।

প্রিসাইডিং অফিসার ঃ তা হয় না, নিজের ভোট নিজেকে দিতে হয়।

বৃদ্ধা ঃ সব পার্টিই যখন সমান, কাউকে একটা দিলেই হবে।

* * *

শিক্ষক ঃ বেরিয়ামের চিহ্ন কী?

ছাত্র ঃ Ba

শিক্ষক ঃ আর সোডিয়ামের?

ছাত্র ঃ Na

শিক্ষক ঃ এক অ্যাটম্ বেরিয়াম আর দু'অ্যাটম্ সোডিয়াম মেশালে কী পাওয়া যাবে?

ছাত্র ঃ Ba Na Na

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। এন্টোমোলজি'র বিষয়বস্তু কী?

২। ইউরোপের ইতিহাসে 'গোলাপের যুদ্ধ' হয়েছিল কাদের মধ্যে?

৩। ২০০৮ সালে কলিন্স ইংলিশ ডিকশনারি কোন্ শব্দটিকে 'ওয়ার্ড অব্ দ্য ইয়ার'-এর স্বীকৃতি দিয়েছিল?

৪। কোন্ বাঙালি বিজ্ঞানীর নামে চাঁদে একটি খাদ আছে?

৫। চীনে প্রথম অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হয় কবে?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। কীটপতঙ্গ
২। ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে
৩। ফেসবুক
৪। ডঃ মেঘনাদ সাহা
৫। ১৯০৮ সালে

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নিয়ে দেশজুড়ে জনজাগরণের পরিকল্পনা সন্তদের

অযোধ্যার করসেবকপুরম থেকে ফিরে ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ ।। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিস্থানে ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য দেশের পূজ্য সন্ত-মহাত্মাদের নেতৃত্বে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আবার এক জনজাগরণের কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই জাগরণ অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ দেশব্যাপী 'হনুমত শক্তি' জাগরণ এবং দেশের ৮ হাজার প্রখণ্ডে (ব্লক) যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মসভার আয়োজন করা হবে বলে পূজ্য সন্তবৃন্দ ঘোষণা করেছেন। গত ১৫ জুলাই ২০১০ অযোধ্যার করসেবকপুরমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চারদিনের কেন্দ্রিয় প্রবন্ধ সমিতির বৈঠকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয়। মন্দির নির্মাণের এই কর্মসূচী এ বছর এপ্রিল মাসে হরিদ্বার কুম্ভে সন্ত উচ্চাধিকার সমিতির সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয়। কেন্দ্রিয় অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শ্রী চম্পত রায় প্রস্তাবটি পাঠ করে তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাসের অধ্যক্ষ পূজ্য মোহন্ত নিত্যগোপাল দাস বলেন, শ্রীরামজন্মভূমি নির্মাণের বিলম্ব আমাদের সকলের কাছে এক লজ্জা ও অসমর্থতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পুরুষ এবং মানবতার অপ্রতিম এক ব্যক্তিত্ব তথা প্রেরণাপুরুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্বকে মহাত্মা গান্ধী, রামমনোহর লোহিয়া থেকে শুরু করে ভারতীয় সংবিধান পর্যন্ত যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও শ্রীরামজন্মভূমি স্থানে মন্দির নির্মাণ করতে না পারায় আজ সমগ্র দেশের কাছে এক লজ্জাজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূজ্য মোহন্ত সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠে সাত্ত্বিক শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে দেশব্যাপী এক বিরাট জাগরণের কথা বলেন। শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাসের অন্যতম বরিষ্ঠ সদস্য ডঃ রামবিলাস বেদান্তি বিশ্বহিন্দু পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রী অশোক সিংহলকে রামায়ণে বর্ণিত জাম্বুবানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বীর হনুমানের শক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে ভাবে মা জানকীর খোঁজে জাম্বুবান শ্রীহনুমানকে তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, সেইভাবে শ্রী অশোকজীর আহ্বানে সারা দেশের সন্ত-মহাত্মা এবং দেশের সাত্ত্বিক শক্তি হনুমানজীর প্রেরণায় রামমন্দির নির্মাণের লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হবে।

আশীর্বাদ সমারোহে প্রসিদ্ধ প্রবচনকার মহন্ত রামানন্দ দাস, অযোধ্যা সন্ত সমিতির সভাপতি শ্রী কানাইয়া দাস সভাতে বক্তব্য রাখেন। সভার সভাপতি ছিলেন পূজ্য রামানুচার্য। স্বামী পুরুষোত্তমাচার্য, ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়াসহ কয়েকশত কেন্দ্রিয়, প্রান্তীয় পদাধিকারী এবং বিশাল সংখ্যক সন্ত-মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

অযোধ্যার করসেবকপুরমে অনুষ্ঠিত বিশ্বহিন্দু পরিষদের এই জনজাগরণের কার্যক্রম আগামী ১৬ আগস্ট ২০১০ তুলসীদাস জয়ন্তী থেকে শুরু করে ১৭ ডিসেম্বর ২০১০ 'গীতাজয়ন্তী' পর্যন্ত— এই চারমাস সারা দেশ জুড়ে গ্রামে-গ্রামে, মহল্লাতে মহল্লাতে, মঠ-মন্দিরে চলবে। হনুমত শক্তি জাগরণের জন্য ধার্মিক অনুষ্ঠান হবে এবং প্রখণ্ডানুসারে মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের কার্যক্রম হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আট হাজার গ্রামে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রী হনুমানের পূজা, হনুমান চাল্লিশা পাঠ, কীর্তন, ভাষণ ও পবিত্র সিন্দুরের তিলকসহ প্রসাদ বিতরণ হবে। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের সংকল্প পুনঃ স্মরণ করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

শুধু বাংলাদেশী-পাকিস্তানী নয়, বিভিন্ন দেশের 'ভিসা'হীনেরাও রয়েছে ভারতে

নিজস্ব সংবাদদাতা ।। ভারতবর্ষের মতো হিন্দু-প্রধান দেশে অবৈধ পাকিস্তানি ও বাংলাদেশীদের অবস্থান নিয়ে দেশের মানুষ সচেতন থাকলেও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের সম্পর্কে ততটা সচেতন নয়। ২০০৩ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ জানিয়েছিলেন— ভারতে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি।

সম্প্রতি একটা দৈনিক সংবাদপত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তান নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু উন্নত দেশগুলির নাগরিকরা অবৈধভাবে এদেশে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছে। যদিও মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের দাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব বিদেশীরা নিজেদের দেশ থেকে ধর্মগত বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু মুম্বই-এর তাজ হোটেলে ২৬।১১ সহ সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে ভারতে বহিরাগতদের মদতে নাশকতার আগুন কতটা ছড়িয়ে গেছে।

সম্প্রতি, মুম্বইয়ের তাজবেঙ্গল কাণ্ডে অভিযুক্ত ডেভিড হেডলির জবানবন্দি ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মহলকে একটা নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত এখনও যে কতটা বিপর্যস্ত সেটা তার জবানবন্দিতেই বেশ স্পষ্ট। গৃহমন্ত্রকের পেশ করা একটা তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বসবাসকারি অধিকাংশ বিদেশী নাগরিকেরই ভিসার মেয়াদ শেষ। তবু তারা নির্বিঘ্নে এদেশে বসবাস করছে। ২০০৮ সালে প্রায় ৬,৫১,৪০৯ জনকে এই অভিযোগে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রায় ১৩,৯৯৫ জনকে সেই বছরেই দেশ থেকে বিতাড়িতও করা হয়েছিল। এই বিষয়ে যে তথ্যটা আশ্চর্যজনক ভাবে জনসমক্ষে এসেছে সেটা হলো আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড সহ প্রভৃতি দেশগুলির কয়েক হাজার বিদেশী নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে। এমনকি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশও এই তালিকায় রয়েছে। প্রায় ৪৭৯ জন চীনদেশের বাসিন্দার নামও এই অবৈধভাবে বসবাসকারীদের নামের তালিকায় রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একজন পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব বিদেশী নাগরিকরা ভারতে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকেন বলে দাবি করেন। ভিসার মেয়াদ যে শেষ হয়ে গেছে এ বিষয়ে তারা অবগত নন বলে জানান।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে যারা নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, তারাই যে এইসব নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এ কথাও তিনি জানান। এক্ষেত্রে তিনি আমেরিকার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটির উল্লেখ করেন যেখানে আমেরিকার নাগরিকরাই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কিছু বিদেশী নাগরিকদের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ যারা আফগানিস্তান, ইয়েমেন ও ইরাক থেকে এসে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে।

এ প্রসঙ্গে পুলিশের একজন কর্তা জানান, ভারতবর্ষের বর্তমান বিশাল জনসংখ্যার সুযোগটাই অন্যান্য দেশের নাগরিকরা নিচ্ছে। অন্য দেশ থেকে এসে এই দেশের নাগরিকদের সঙ্গে তারা খুব সহজেই মিলে যাচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে ইদানীং যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কোনও বিদেশী নাগরিক ধরা পড়লেই তাদের সঠিক পরিচয় ও আসার কারণ খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি জানান। পুলিশ মহলের সূত্র অনুযায়ী, যেসব বিদেশী নাগরিকরা অবৈধভাবে দেশে বসবাস করছে তাদের সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি জায়গায় পুলিশের ক্রিয়া কৌশলকে আরও সক্রিয় করা হয়েছে। প্রত্যেক বিদেশীরই আঞ্চলিক বিদেশ দপ্তরে এসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও এই ব্যাপারে নিকটবর্তী থানার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে বলেও জানানো হয়।

ক্রমশ কমছে হিন্দু জনসংখ্যা
নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিজীবী ও সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। সম্প্রতি একটি সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতি ১০ বছর অন্তর দেশের হিন্দু জনসংখ্যা ১ শতাংশ হারে কমছে। ১৮৮১ সালে যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল অখণ্ড ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ, ১৯৪১ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশে।

এতো স্বাধীনতার পূর্বের তথ্য। হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাসের হার স্বাধীনতার পরও বজায় থেকেছে। ১৯৫১ সালে দেশে হিন্দুরা ছিল ৮৮ শতাংশ যেটা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৮২ শতাংশে। জনভারসাম্যের এই বিচ্যুতির সময় সরকারি মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নেতাই হলেন হিন্দু। কিন্তু তাদের তরফ থেকেও এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। একসময় সরকারি জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে তৎকালীন কিছু হিন্দু সংগঠন এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করলেও পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির চাপে ও জনসমর্থনের অভাবে তারাও স্তব্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অভিমত— এনিয়ে চিন্তা করার অর্থই হলো নাকি সময়ের অপব্যবহার। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে প্রভাবশালী লোকেরা যদি এভাবে এই সমস্যার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে তাহলে এই দেশ খণ্ডিত হয়ে আবার একটা পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। কেননা, দেশের যে অংশেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে সেই অংশই এই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

বঙ্গম

রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংস্কার ভারতীর কবিপ্রণাম

বিকাশ ভট্টাচার্য।। এবছরটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধজন্মশতবর্ষ। সংস্কার ভারতী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে কবিপ্রণাম-এর অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতার কল্যাণভবনে ২৫ বৈশাখ (৯ মে)। সঙ্গীত, নৃত্য ছাড়াও অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল শিশুকিশোর শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নাটক "বিনি পয়সার ভোজ"। রবীন্দ্রনাথের গল্পে নাট্যরূপ দেন সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনায় ছিলেন প্রদীপ দাস।

গুণীজন সম্বর্ধনা

গত ৩রা জুলাই শনিবার বিজন থিয়েটারে বাগুইহাটি শাখা ও রূপান্তর নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই প্রথিতযশা শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলেন, সংস্কার ভারতীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। এর উদ্দেশ্য মহৎ। এখন এই বিরাশী বছর বয়সে বেশি আসতে পারি না। তবে আজ এসে পড়ে ভালো লাগছে! গোরা সর্বাধিকারী স্বল্প ভাষণে জানান তিনি বোলপুর শাখার সঙ্গে যুক্ত। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর বাগুইহাটি শাখার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গানের মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠান করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন সবিতা দত্ত।

মেঘমল্লার

ওই একই অনুষ্ঠানে বাগুইহাটির রূপান্তর নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্রের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও কবিতা অবলম্বনে "মেঘমল্লার" নৃত্যগীতি আলেখ্য মঞ্চ স্থ করেন। অপূর্ব কোরিওগ্রাফী, দৃষ্টিনন্দন

গুণীজন সংবর্ধনা।

সাজসজ্জা ও আলোকসম্পাতে অনুষ্ঠানটি দর্শকের অভিনন্দনে ধন্য। নৃত্যপরিচালনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন সুমনা পাল।

রবীন্দ্রনাথের গানে উপনিষদের প্রভাব

ভারতের ধর্ম বা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি উপনিষদ ও বেদের যুগের মানুষ বিশ্বসৃষ্টির কারণটির ব্যাখ্যা যেভাবে করেছিলেন, এ যুগেও তার প্রভাব কমেনি। সেই চিন্তা আজও ভারতবাসীর মনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা উপনিষদের প্রভাব দেখি। এই বিষয়টিকেই নানান উদাহরণ ধরে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের মাধ্যমে তুলে ধরলেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণ কলকাতার শিল্পীরা তাদের গীতি আলেখ্যে। গত ১৩ জুন শনিবার সন্ধ্যায় লেক এভেনিউ-এর দুর্গামণ্ডপে এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাণ্ডেলে কবিপ্রণাম

সংস্কার ভারতীর নবগঠিত ব্যান্ডেল শাখা গত ১৩ জুন তাদের প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানটি করে কবিপ্রণামের মাধ্যমে। সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিগুরুর জীবনের ছোট ছোট কিছু ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি দর্শকদের আকৃষ্ট করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌরী সেনগুপ্ত।

দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলার স্বাদেশিকতার বড়ো দান পৌরুষের তেজ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখি। স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত রচনার মূল সুর হচ্ছে নির্ভীকতা, গানেও তাই। 'দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ'— এই গীতিআলেখ্য-এর মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ প্রভাতী অনুষ্ঠানে নবদ্বীপ শাখার শিল্পীরা কবিকে প্রণাম জানান। গীতিআলেখ্যটি

রূপান্তরের মেঘমল্লার

পরিচালনা করেন চণ্ডী ব্যানার্জী। শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন মোট ষাটজন শিল্পী।

মেদিনীপুরে প্রতিযোগিতা

গত ১১ জুলাই রবিবার স্থানীয় সিপাহীবাজার শিশুমন্দিরে সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর শাখা রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ও রবীন্দ্রনৃত্যের এক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মোট দেড়শ জন প্রতিযোগীর মধ্যে কেবলমাত্র আবৃত্তিতেই অংশ নেয় ষাটজন। আগামী জন্মাষ্টমীর দিন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান তাঁর প্রথম গীতসংগ্রহ 'রবিচ্ছায়া'তে (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হওয়ার আগেই স্বামীজীর কণ্ঠে গীত হয়েছে। এর কয়েকটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে ঠাকুরবাড়িতে গাওয়া হয়। রবীন্দ্র-গবেষকদের অনুমান ওই উৎসবে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে যত গান শুনিয়েছেন তার মধ্যে বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। এইসব গানের মধ্যে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনই আটটি গান ভাষ্যসহ পরিবেশিত হলো গত ১১ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় আর্য্যসমিতি হল-এ বেহালা শাখার শিল্পীবৃন্দের কণ্ঠে। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন অনুপ দাস। ওই একই অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয় 'সৃজনী' সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের শিল্পীদের কণ্ঠে। পরিচালনায় ছিলেন লিপিকা হালদার।

শব্দরূপ - ৫৫৭

সুতপা সাহা

■	■	১	২			৩	■
■	■	■		■	■		■
৪	৫	■	৬		৭		
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২	১৩				■	১৪	
■		■	■		■	■	■
■	১৫					■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পদ্মের মতো সুন্দর চোখ, ৪. অন্য নামে কুন্তী, ৬. ইঙ্গ শব্দে চুন ও অঙ্গারঘটিত দ্রব্যবিশেষ, ৮. চতুর্থ পাণ্ডব, ১০. বলরাম-এর অন্য নাম, এর জুড়ি শব্দ কানাই, ১২. পদ্মের উপর উপবেশন তাই ব্রহ্মার এই নাম, দুয়ে-পাঁচে হৃদয়, ১৪. জতু, গালা, ১৫. এই গ্রন্থে বিষ্ণুর দশমাবতার কাহিনী সংকলিত আছে।

উপর-নীচ ঃ ২. শিবের রুদ্ররূপ, ৩. সম্মানসূচক রাজদত্ত পরিচ্ছদ, প্রথম দুয়ে খিল, দুয়ে-তিনে ইঙ্গ শব্দে মিথ্যা কথা, ৫. দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান, ৭. বিশেষণে বর্ষাকালীন, আগাগোড়া বলয়, ৯. রাধিকার ননদিনী, ১০. তরুশ্রেণী, প্রথম দুয়ে জঙ্গল, ১১. বুধপত্নী, ১৩. যষ্টিমধু, মহুয়া ফুল বা গাছ।

সমাধান শব্দরূপ ৫৫৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
নীলিমা রায়
নলহাটি, বীরভূম।

মা	রী	চ	■	বা	ল	ভো	গ
দ্রী	■	তু	র্ব	সু	■	■	■
■	হ	র	■	কি	ম্পু	রু	ষ
■	রি	■	■	■	■	ক্ষ	■
■	প্রি	■	■	■	■	র	■
হ	য়	গ্রী	ব	■	ম	থ	■
■	■	■	দ	খি	ন	■	গ
যু	ধি	ষ্ঠি	র	■	সা	র	দা

● ৫৫৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ আগস্ট, ২০১০ সংখ্যায়

ষোড়শ মহাজনপদ

(১১ পাতার পর)

গঙ্গার পথে বাণিজ্যকে মগধের অধীনে আনাই ছিল মগধ-কোশল, মগধ-লিচ্ছবি যুদ্ধের আসল কারণ। প্রথম জীবনে অজাতশত্রু চরম বৌদ্ধ বিদ্বেষী হলেও পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের শরণ নেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারহুতের ফলক চিত্রে ভগবান তথাগতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের চিত্র খোদিত আছে। অজাতশত্রুর পর মগধের সিংহাসনে বসেন উদয়িন বা উদয়ভদ্র। উদয়িনের প্রধান কৃতিত্ব ছিল গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলগ্রাম দুর্গকে কেন্দ্র করে পাটলীপুত্র নগরের নির্মাণ। উদয়িনের পর অনিরুদ্ধ, মণ্ডু প্রভৃতি রাজারা মগধের সিংহাসনে বসেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই ছিলেন পিতৃহন্তা। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন দর্শক বা নাগদর্শক। তাঁকে নিহত করে তাঁর সভাসদ শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করলে হর্যঙ্ক বংশের পতন হয়।

শিশুনাগ ছিলেন বৈশালীর ভূতপূর্ব রাজপুত্র। তিনি অবন্তী এবং বৎস রাজ্য দখল করেন এবং মগধের রাজধানী তাঁর পিতৃরাজ্য বৈশালীতে স্থানান্তর করেন। শিশুনাগের পর মগধের সিংহাসনে বসেন কালাশোক। তিনি পাকাপাকিভাবে পাটলীপুত্রে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে তাঁর রাণীর সহায়তায় তিনি স্বয়ং এবং তার দশ পুত্র এক শূদ্রের হাতে নিহত হন। এই শূদ্র আর কেউ নয় ইতিহাস বিখ্যাত মহাপদ্ম নন্দ। তিনি শৈশুনাগ বংশকে উচ্ছেদ করে নন্দ বংশের শাসন স্থাপন করেন। মহাপদ্মকে নিয়ে নন্দ বংশে মোট নয় জন রাজা রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। এই সময়ে মগধের সামরিক শক্তি এত বুদ্ধি পেয়েছিল যে সেই সংবাদ দিগ্বিজয়ী গ্রীক আলেকজাণ্ডারের কাছেও পৌঁছেছিল। সম্ভবত সেই কারণে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে মগধের সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি হতে সাহস করেননি। এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এবং গুরু কৌটিল্য বা চাণক্যের সহায়তায় মগধকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। তাঁর পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র মহান অশোকের হাতে মগধের মৌর্য জৈনধর্মের অনুসারী হয়ে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা অশোকের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তিনি রাজ্য জয় ও হিংসা পরিত্যাগ করে অহিংসার ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুণাল মগধের সিংহাসনে বসেন। বৃহদ্রথ ছিলেন এই বংশের সর্বশেষ রাজা। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য বংশের পতন ঘটান। বিশাল মগধ সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সংকীর্ণ এবং পরে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

Swastika
9 August - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

2 years of Sucessful Governance

Healthy Smile
is the Symbol of Strong Health

In the Health Sector the Government of Karnataka has evolved many unique schemes to take care of the health of its Citizens.
Arogya Kavacha - 108 Scheme has become a boom in all such cases. Over 1 crore calls were attended to resulting in saving 4.5 lakhs lives. As many as 517 Ambulances are in operation covering all districts. The Government is marching ahead in several fields as the Model State in the Country.

Health Schemes

- Arogya Kavacha - 108 ambulance services in all districts
- 'Vajpayee Arogya Sri' scheme launched in 6 districts of Northern Karnataka to benefit 14.5 lakh BPLfamilies by providing free medical treatment / surgeries upto a limit of Rs. 2. lakh per family. As many as 664 families have been benefitted under the scheme.
- Rs. 9.56 crore has been spent on surgeries to 3,609 students under the Suvarna Arogya Chaitanya Scheme
- 24x7 medical treatment facility started in 975 primary health centres
- 60 bed Ayurveda hospital in Shimoga at the cost of Rs.2 crore is in completion stage
- Rs.5 crore for the upgradation of Government Ayurveada Hospitals at Bangalore & Mysore
- 65 new hospitals started in urban and rural areas.
- Work on construction of 100-bed Hi-tech Panchakarma Hospital building in Mysore at a cost of Rs 3 crore under progress.
- Infant mortality rate has been brought down from 47 No. to 45 in the State. Death rate of expectant mothers have come down from 228 to 213 No. and deliveries in hospitals has increased from 65 % to 92 %.
- Sanction for setting up two regional drugs experiment laboratories at Hubli in North Karnataka and Bellary at a total cost of Rs. 15 crore.

Sri. B.S. Yeddyurappa
Hon'ble Chief Minister

SALIENT FEATURES IN THE 2010-11 BUDGET

- Free Delivery Facility to rural women in primary health centres.
- Special assistance of Rs 1,000 each to rural women undergoing delivery in private hospitals.
- Free Medical Check-ups for all girls enrolled under the Bhagyalakshmi Scheme.

Development the Keyword of Administration
karnataka information

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com